বাণী - বিচিত্রা

দশম সংস্করণ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩

সক্রিয় পরিকল্পনায় ও পরিমার্জনায় :

ফণিভূষণ বিশ্বাস এম. এ., বি. টি., পি. টি. অবসর প্রাপ্ত জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক
নয়া শিক্ষা, শিশু শিক্ষার গোড়া পত্তন ইত্যাদি পুস্তক প্রণেতা।

ও

দুলালচন্দ্র মাহাত এম, এ., ডিপ্লোমা ইন পি. জি. বি. টি.
সহকারী প্রধান শিক্ষক, আর. বি. বি. উচ্চ বিদ্যালয়, গরজয়পুর, পুরুলিয়া

অলঙ্করণ, অঙ্গসজ্জা ও মাধুর্যদানে :
ও. সি. গাঙ্গুলী ও অধ্যাপক ভগবানদাস গাঙ্গুলী
আর্টপুল—দেবী প্রেস কলিকাতা-৯

মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

শ্রীশান্তি রঞ্জন সান্যাল ৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা ৯ কর্তৃক প্রকাশিত এবং
মুদ্রণে—ইম্প্রেসিভ ইম্প্রেশন ১০, ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সূচীপত্র
গদ্যাংশ

সূচীপত্র

পদ্যাংশ

সারসী ও তাহার শিশু-সন্তান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এক সারসী, শিশুসন্তানগুলি লইয়া, কোনও ক্ষেত্রে বাস করিত। ঐ ক্ষেত্রের শস্য সকল পাকিয়া উঠিলে, সারসী বুঝিতে পারিল, অতঃপর কৃষকেরা শস্য কাটিতে আরম্ভ করিবেক। এই নিমিত্ত, প্রতিদিন, আহারের অন্বেষণে বাহিরে যাইবার সময়, সে শিশুসন্তানদিগকে বলিয়া যাইত, তোমরা আমার আসিবার পূর্বে, যাহা কিছু শুনিবে, আমি আসিবামাত্র, সে সমুদয় অবিকল আমায় বলিবে।

একদিন সারসী বাসা হইতে বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ক্ষেত্রস্বামী শস্য কাটিবার সময় হইয়াছে কিনা, বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইল, এবং চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, শস্য সকল পাকিয়া উঠিয়াছে, আর কাটিতে বিলম্ব করা উচিত নয়। অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহারা কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারসী বাসায় আসিলে, তাহার সন্তানেরা ঐ সকল কথা জানাইল, এবং কহিল, মা! তুমি আমাদিগকে শীঘ্র স্থানান্তরে লইয়া যাও। আর, তুমি আমাদিগকে এখানে রাখিয়া, বাহিরে যাইও না। যাহারা শস্য কাটিতে আসিবেক, তাহারা দেখিলেই, আমাদের প্রাণবধ করিবেক। সারসী কহিল, বাছা সকল! তোমরা এখনই ভয় পাইতেছ কেন। ক্ষেত্রস্বামী যদি, প্রতিবেশীদের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে শস্য কাটিতে আসিবার অনেক বিলম্ব আছে।

পর দিবস, ক্ষেত্রস্বামী পুনরায় উপস্থিত হইল ; দেখিল যাহাদের উপর ভার দিয়াছিল, তাহারা শস্য কাটিতে আইসে নাই। কিন্তু, শস্য সকল সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিয়াছিল ; অতঃপর না কাটিলে, হানি হইতে পারে ; এই নিমিত্ত সে কহিল, আর সময় নষ্ট করা হয় না ; প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে বিস্তর ক্ষতি হইবেক। আর তাহাদের ভরসায় না থাকিয়া আপন ভাই বন্ধুদিগকে বলি, তাহারা সত্বর কাটিয়া দিবেক। এই বলিয়া সে আপন পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, তুমি তোমার খুড়াদিগকে আমার নাম করিয়া বলিবে, যেন তাহারা, সকল কর্ম রাখিয়া কাল সকালে আসিয়া, শস্য কাটিতে আরম্ভ করে। এই বলিয়া, ক্ষেত্রস্বামী চলিয়া গেল।

সারসশিশুগণ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং সারসী আসিবামাত্র, কাতর বাক্যে কহিতে লাগিল, মা! আজ ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া এই এই কথা বলিয়া গিয়াছে। তুমি আমাদের একটা উপায় কর। কাল তুমি, আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া, যাইতে পারিবে না ; যদি যাও, আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সারসী শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, কহিল, যদি এই কথা মাত্র শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, ভয়ের বিষয় নাই। যদি ক্ষেত্রস্বামী, ভাই বন্ধুদিগের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা হইলে শস্য কাটিতে আসিবার, এখনও অনেক বিলম্ব আছে। তাহাদেরও শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা, আগে আপনাদের শস্য না কাটিয়া, কখনও ইহার শস্য কাটিতে আসিবেক না। কিন্তু ক্ষেত্রস্বামী, কাল সকালে আসিয়া, যাহা কহিবেক, তাহা মন দিয়া শুনিও, এবং আমি আসিলে, বলিতে ভুলিও না।

পরদিন, প্রত্যূষে সারসী আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইলে, ক্ষেত্রস্বামী তথায় উপস্থিত হইল ; দেখিল, কেহই শস্য কাটিতে আইসে নাই ; আর শস্য সকল অধিক পাকিয়াছিল এজন্য, ঝরিয়া ভূমিতে পড়িতেছে। তখন সে, বিরক্ত হইয়া, আপন পুত্রকে কহিল, দেখ, আর প্রতিবেশীর, অথবা ভাই বন্ধুর, মুখ চাহিয়া থাকা উচিত নহে।

আজ রাত্রিতে তুমি, যতজন পাও, ঠিকা লোক স্থির করিয়া রাখিবে। কাল সকালে, তাহাদিগকে লইয়া, আপনারাই কাটিতে আরম্ভ করিব, নতুবা বিস্তর ক্ষতি হইবেক।

সারসী বাসায় আসিয়া, এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল, অতঃপর, আর এখানে থাকা হয় না ; এখন অন্যত্র যাওয়া কর্তব্য। যখন কেহ, অন্যের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত না থাকিয়া, স্বয়ং আপন কর্মে মন দেয়, তখন ইহা স্থির জানা উচিত যে, সে যথার্থই ঐ কর্ম সম্পন্ন করা মনস্থ করিয়াছে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। সারসী প্রতিদিন তাহার শিশুসন্তানদিগকে কি বলিয়া যাইত? [২]

২। ক্ষেত্রস্বামী পর পর কাহাদিগের উপর শস্য কাটিবার ভার দিয়াছিল এবং তাহার ফল কি হইয়াছিল? [২+২+২]

৩। সারসশিশুগণ ক্ষেত্রস্বামীর কথা শুনিয়া কেন ভয় পাইত? তাহাদিগকে জননী কি বলিয়া আশ্বাস দিত? [২+৪]

৪। সর্বশেষে ক্ষেত্রস্বামী তাহার পুত্রকে কি আদেশ দিল? শাবকগণের মুখ হইতে তাহা শুনিয়া সারসী কি স্থির করিল? [২+২]

৫। গল্পটি হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করি? [৩]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৬। **যে কোন ৫টি শব্দ দিয়া বাক্য গঠন কর ঃ** অতঃপর, নিমিত্ত, অন্বেষণ, স্থানান্তর, হানি হওয়া, ঈষৎ, প্রত্যূষ, মনস্থ করা। [২×৫]

৭। **আটটি শব্দের মধ্যে যে কোন তিনটি বিশেষ্য ও তিনটি বিশেষণের রূপান্তরিত রূপ লিখ ঃ** [১×৬]

বিবেচনা, উচিত, শীঘ্র, নিশ্চিন্ত, আরম্ভ, হাস্য, বিরক্ত, ভীত।

৮। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) ক্ষেত্রস্বামী শস্য কাটিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল কেন? (খ) প্রতিবেশীরা শস্য কাটিয়া দিল না কেন? (গ) ভাই বন্ধুরা শস্য কাটিল না কেন? (ঘ) সারসী কখন মনে করিল যে এইবার শস্য কাটা হইবে? [২×৪]

বৃষ্টি

বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চল নামি—আষাঢ় আসিতেছে—চল নামি।

আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু, একা একজনে যুথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না। কিন্তু আমরা সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি,—মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই। ক্ষুদ্র কে?

দেখ, যে একা, সেই ক্ষুদ্র, সেই সামান্য। যাহার ঐক্য নাই, সেই তুচ্ছ। দেখ, ভাই সকল, কেহ একা নামিও না—অর্ধপথে ঐ প্রচণ্ড রবির কিরণে শুকাইয়া যাইবে—চল, সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে, অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে, এই পৃথিবী ভাসাইব।

পৃথিবী ভাসাইব। পর্ব্বতের মাথায় চড়িয়া, তাহার গলা ধরিয়া বুকে পা দিয়া, পৃথিবীতে নামিব ; নির্ঝরপথে বাহির হইব। নদী-কূলের শূন্যহৃদয় ভরাইয়া, তাহাদিগকে রূপের বসন পরাইয়া, মহা-কল্লোলে ভীমবাদ্য বাজাইয়া, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ মারিয়া মহানন্দে ক্রীড়া করিব। এসো, সবে নামি।

কে যুদ্ধ দিবে—বায়ু। ইস্ ! বায়ুর ঘাড়ে চড়িয়া দেশ দেশান্তরে বেড়াইব। আমাদের এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র ; তাহার সাহায্য পাইলে স্থলে জলে এক করি। তাহার সাহায্য পাইলে বড় বড় গ্রাম, অট্টালিকা, পোত মুখে করিয়া ধুইয়া লইয়া যাই। তাহার ঘাড়ে চড়িয়া, জানালা দিয়া লোকের ঘরে ঢুকি। বায়ু! বায়ু তো আমাদের গোলাম।

দেখ ভাই, কেহ একা নামিও না—ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। চল—আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—কিন্তু, পৃথিবী রাখিব। শস্যক্ষেত্রে শস্য জন্মাইব—মনুষ্য বাঁচিবে। নদীতে নৌকা চালাইব—মনুষ্যের বাণিজ্য বাঁচিবে। তৃণলতা বৃক্ষাদির পুষ্টি করিব—পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বাঁচিবে। আমরা ক্ষুদ্র বৃষ্টিবিন্দু—আমাদের সমান কে ? আমরাই সংসার রাখি।

দেখ, দেখ আমাদের দেখিয়া পৃথিবীর আহ্লাদ দেখ ! গাছপালা মাথা নাড়িতেছে—নদী দুলিতেছে, ধান্যক্ষেত্র মাথা নামাইয়া প্রণাম করিতেছে—চাষা চষিতেছে—ছেলে ভিজিতেছে—কেবল বেনে বউ আমসী ও আমসত্ব লইয়া পালাইতেছে। মর পাপিষ্ঠা ! দুই একখানা রেখে যা না—আমরা খাব।

আমরা জাতিতে জল কিন্তু রঙ্গরস জানি ; মল্লিকার মুখ ধুইয়া লইয়া গিয়া ভ্রমরের অন্ন মারি। মুড়ি মুড়কির দোকান দেখিলে প্রায় ফলার মাখিয়া দিয়া যাই। রামী চাকরাণী কাপড় শুকাইতে দিলে, প্রায় তাহার কাজ বাড়াইয়া রাখি। আমরা কি কম পাত্র ?

তা যাক্—আমাদের বল দেখ। দেখ, পর্ব্বত-কন্দর, দেশ প্রদেশ ধুইয়া লইয়া, নূতন দেশ নির্মাণ করিব। কোন দেশের মানুষ রাখিব—

কোন দেশের মানুষ মারিব—কত জাহাজ বহিব, কত জাহাজ ডুবাইব—পৃথিবী জলময় করিব—অথচ আমরা কি ক্ষুদ্র! আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান কে?

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। "এক একজনে যুথিকাকলির শুষ্ক মুখও ধুইতে পারি না—মল্লিকার ক্ষুদ্র হৃদয় ভরিতে পারি না।"—(ক) কে এই কথা বলিতেছে? (খ) ইহার অর্থ কি? [১+৩]

২। "মনে করিলে পৃথিবী ভাসাই।"—কাহারা কি ভাবে ভাসাইবে? ভাসাইবার শক্তি কি ভাবে আসিল? [২+৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

৩। "ঐক্যেই বল"—এই উক্তির দ্বারা কি বোঝা যায় তাহা ব্যাখ্যা কর। [৩]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

৪। "আমরা জাতিতে জল কিন্তু রঙ্গরস জানি"—কি সে রঙ্গরস? দুই একটা উদাহরণ দাও। [২]

৫। "আমরাই সংসার রাখি"—(ক) কাহারা এই কথা বলিতেছে? (খ) কি ভাবে উহারা সংসার রক্ষা করে? [১+৩]

৬। **ব্যাখ্যা লিখ :** (ক) ঐক্যেই বল—নহিলে আমরা কেহ নই। (খ) আমাদের মত ক্ষুদ্র কে? আমাদের মত বলবান্ কে? [৫×২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

৭। **স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পুংলিঙ্গ এবং পুংলিঙ্গ হইতে স্ত্রীলিঙ্গে রূপ দাও :** পরোপকারী, নদী, পাপিষ্ঠা, চাকরাণী। [১×৪]

৮। **যে কোন ৬টি শব্দের অর্থ লিখ :** বৃষ্টিবিন্দু, ভীমবাহু, দেশান্তর, কাদম্বিনী, প্রসৃতি, সূত্রকায়া, বিশীর্ণ, কুলপ্লাবিণী, পর্বত-কন্দর। [১×৬]

৯। **মৌখিক প্রশ্ন :** (ক) একটি বৃষ্টিবিন্দু কিছুই না অথচ বহু সংখ্যক বিন্দু একত্রে পৃথিবী ভাসাইতে পারে—ইহা হইতে কি বুঝিলে? (খ) এ বর্ষাযুদ্ধে বায়ু ঘোড়া মাত্র।—কেন? [২+২]

কবিতা রচনারম্ভ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার বয়স তখন সাত-আট বছরের বেশী হইবে না। আমার এক ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃপ্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়ো। তিনি তখন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবেশ করিয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে হ্যামলেটের স্বগত উক্তি আওড়াইতেছেন। আমার মতো শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্য তাঁহার হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে।" বলিয়া, পয়ার-ছন্দে চৌদ্দ অক্ষর যোগাযোগের রীতিপদ্ধতি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন।

গোটা কয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যখন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল, তখন পদ্য রচনার মহিমা সম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না।....

ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন ঠেকাইয়া রাখে কে। কোনো একটি কর্মচারীর কৃপায় একখানি নীল কাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে স্বহস্তে পেন্‌সিল দিয়া কতকগুলো অসমান লাইন কাটিয়া বড়ো বড়ো কাঁচা অক্ষরে পদ্য লিখিতে শুরু করিয়া দিলাম।

আমি কবিতা লিখি, এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ছিল না। সাতকড়ি দত্ত মহাশয় যদিচ আমাদের ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ ছিল।....তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লিখিয়া থাক।" লিখিয়া যে থাকি সে-কথা গোপন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই-এক পদ কবিতা দিয়া, তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

আমি ইহার সঙ্গে যে-পদ্য জুড়িয়াছিলাম তাহার কেবল দুটো লাইন মনে আছে।....

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।....

আর-একটি কোনো ব্যক্তিগত বর্ণনা হইতে চার লাইন উদ্ধৃত করি, আশা করি, ইহার ভাষা ও ভাব অলংকারশাস্ত্রে প্রাঞ্জল বলিয়া গণ্য হইবে—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুশ শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

আমাদের ইস্কুলের গোবিন্দবাবু ঘন কৃষ্ণবর্ণ বেঁটেখাটো মোটাসোটা

মানুষ। ইনি ছিলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট্। কালো চাপকান পরিয়া দোতালায় আপিস ঘরে খাতাপত্র লইয়া লেখাপড়া করিতেন। ইঁহাকে আমরা ভয় করিতাম। ইনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের দণ্ডধারী বিচারক। একদিন অত্যাচারে পীড়িত হইয়া দ্রুত-বেগে ইঁহার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আসামী ছিল পাঁচ-ছয়জন বড়ো বড়ো ছেলে; আমার পক্ষে সাক্ষী কেহই ছিল না। সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল। সেই ফৌজদারিতে আমি জিতিয়াছিলাম এবং সেই পরিচয়ের পর হইতে গোবিন্দবাবু আমাকে করুণার চক্ষে দেখিতেন।

একদিন ছুটির সময় তাঁহার ঘরে আমার হঠাৎ ডাক পড়িল। আমি ভীত চিত্তে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি কবিতা লেখ।" কবুল করিতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করিলাম না। মনে নাই কী একটা উচ্চ অঙ্গের সুনীতি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কবিতা লিখিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। গোবিন্দ-বাবুর মতো ভীষণ গম্ভীর লোকের মুখ হইতে কবিতা লেখার এই আদেশ যে কিরূপ অদ্ভুত সুললিত, তাহা যাঁহারা তাঁহার ছাত্র নহেন তাঁহারা বুঝিবেন না। পরদিন লিখিয়া যখন তাঁহাকে দেখাইলাম তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া ছাত্রবৃত্তির ক্লাসের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "পড়িয়া শোনাও।" আমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া গেলাম।

....অধিকাংশ ছেলেই আপনাদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, এ লেখা নিশ্চয় আমার নিজের রচনা নহে। একজন বলিল, যে ছাপার বই হইতে এ লেখা চুরি সে তাহা আনিয়া দেখাইয়া দিতে পারে। কেউই তাহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল না। বিশ্বাস করাই তাহাদের আবশ্যক—প্রমাণ করিতে গেলে তাহার ব্যাঘাত হইতে পারে। ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তাহারা যে-পথ অবলম্বন করিল তাহা নৈতিক উন্নতির প্রশস্ত পথ নহে।....

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। (ক) কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কে প্রথম বদলাইয়া দিলেন ? [১]
(খ) সাতকড়ি দত্ত কে ? তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কি সম্পর্ক ? কি ভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কবিতা লেখায় সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন ? [১+১+৩]

২। রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনার ৬টি চরণ উদ্ধৃত করিয়া একটি দৃষ্টান্ত দাও। [৬]

৩। 'সাক্ষীর মধ্যে ছিল আমার অশ্রুজল'—কি প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইয়াছে ? কে বলিতেছেন ? [২+১]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

৪। (ক) ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন আর ঠেকাইয়া রাখে কে ? কি প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে ? (খ) ইহার পরে কবিযশঃপ্রার্থীর সংখ্যা ...প্রশস্ত পথ নহে—একথা কেন বলা হইয়াছে ? [৩+৩]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৫। **যে কোন পাঁচটি পদকে বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে রূপান্তরিত কর ঃ** উৎসাহ, কৌতূহল, মহিমা, প্রাঞ্জল, প্রমাণ, নৈতিক। [১×৫]

৬। **চলিত রীতিতে রূপান্তরিত কর ঃ** (ক) এই পদ্য যে নিজে চেষ্টা করিয়া লেখা যাইতে পারে, এ কথা কল্পনা করিতেও সাহস হইত না। (খ) ভয় যখন একবার ভাঙিল তখন ঠেকাইয়া রাখে কে ? [২+২]

৭। **যে কোন ৬টি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ** পদ্য, চোর, শিক্ষক, ভয়, কৃষ্ণবর্ণ, মোটা, ছেলে, সুনীতি, গম্ভীর, বিশ্বাস। [১×৬]

৮। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) কবিতা লিখিবার প্রথম ভয় ভাঙিবার পর কবি কি করিয়াছিলেন ? (খ) 'তোমাকে পদ্য লিখিতে হইবে'—এই কথা কে কাহাকে বলিয়াছিলেন ? (গ) রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই'—পরের চরণটি কি ? (ঘ) 'পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে'—কেন বল তো ? [২+১+২+৩]

স্বদেশী যুগের কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সবার ভিতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ। সবাই বলে, হুকুম আয়া। আরে এই হুকুমই বা দিলে কে, কেন? তা জানে না কেউ, জানে কেবল—হুকুম আয়া। তাই মনে হয় এটা সবার ভিতর থেকে এসেছিল—রবিকাকাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো, তিনিও বোধ হয় বলতে পারবেন না কে দিল এই তাগিদ, কোত্থেকে এল এই স্বদেশী হুজুগ। আমি এখনো ভাবি, এ একটা রহস্য। বোধ হয় ভূমিকম্পের পরে একটা বিষম নাড়া-চাড়া—সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। বড়ো-ছোট মুটে-মজুর সব যেন এক ধাক্কায় জেগে উঠল। তখনকার স্বদেশী যুগে এখনকার মতো মারামারি ঝগড়া-ঝাঁটি ছিল না। তখন স্বদেশীর একটা চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে। এমন একটা ঢেউ যাতে দেশ উর্বরা হতে পারত, ভাঙত না কিছু। সবাই দেশের জন্য ভাবতে শুরু করলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্য কিছু কোরতে হবে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন রবিকাকা। আমরা সব

একদিন জুতোর দোকান খুলে বসলুম। বাড়ির বুড়ো সরকার খুঁত খুঁত করতে লাগল, বলে, বাবুরা ওটা বাদ দিয়ে স্বদেশী করুন না—জুতোর দোকান খোলা, ও-সব কেন আবার। মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হল দোকানের সামনে—"স্বদেশী ভাণ্ডার"! ঠিক হল স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে। বলু খুব খেটেছিল—নানা দেশ ঘুরে যেখানে যা স্বদেশী জিনিস পাওয়া যায়—মার পায়ের আলতা থেকে মেয়েদের পায়ের জুতো সব কিছু যোগাড় করেছিল, তার ঐ শখ ছিল। পুরোদমে দোকান চলছে। শুধু কি দোকান—জায়গায় জায়গায় পল্লীসমিতি গঠন হচ্ছে। প্লেগ এল, সেবাসমিতি হল, তাতে সিষ্টার নিবেদিতা এসে যোগ দিলেন। চারিদিক থেকে একটা 'সেল্‌ফ স্যাক্‌রিফাইসের' ও একটা আত্মীয়তার ভাব এসেছিল সবার মনে।

পশুপতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, মাতৃভাণ্ডার সৃষ্টি হবে,—ন্যাশন্যাল ফণ্ড,—টাকা তুলতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির ছাদের উপর মস্ত টিনের ট্রাঙ্ক, তাতে সাদা রঙে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—মাতৃভাণ্ডার। সবাই চাঁদা দিলে—একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের ভাণ্ডারে। অনেক সাহেবসুবোও ব্যাপার দেখতে ছুটেছিল, তারাও টুপি উড়িয়ে 'বন্দে মাতরম্' রব তুলেছিল থেকে থেকে। তারা পুলিসের লোক, কি খবরের কাগজের রিপোর্টার তা কে জানে।

রামকেষ্টপুরের রেলের কুলিরা খবর দিলে, বাবুরা যদি আসেন আমাদের কাছে তবে আমরাও টাকা দেব। আমরা, রবিকাকা সবাই ছুটলাম। তখন বর্ষাকাল—একটা টিনের ঘরে আমাদের আড্ডা হল। এক মুহুরী টাকা গুনে নিলে। অতটুকু টিনের ঘরে তো মিটিং হতে পারে না। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে—বাইরে সারি সারি রেলগাড়ির নিচে শতরঞ্চি বিছিয়ে বক্তৃতা হচ্ছে, আর আমি ভাবছি—এই সময়েই যদি ইঞ্জিন এসে মালগাড়ি টানতে শুরু করে তবেই গেছি আর কি! এই ভাবতে ভাবতে একটা কুলি এসে খবর দিলে সত্যিই একটা ইঞ্জিন আসছে। সবাই হুড়দাড় করে উঠে পড়লুম। শ-খানেক টাকা সেই কুলিদের কাছ থেকে পেয়েছিলুম।....

আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি, হাতে অন্নবস্ত্র বরাভয়—এক জাপানী আর্টিস্ট সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলে। কোথায় যে গেল পরে পতাকাটা, জানিনে। যাক্, রবিকাকা গান তৈরী করলেন, দিনুর উপর ভার পড়ল, সে দলবল নিয়ে সেই পতাকা ঘাড়ে করে সেই গান গেয়ে গেয়ে চোরবাগান ঘুরে চাঁদা তুলে নিয়ে এল। তখন সব স্বদেশের কাজ, স্বদেশী ভাব, এই ছাড়া কথা নেই। নিজেদের সাজসজ্জাও বদলে ফেললুম।

তখনকার সেই স্বদেশী যুগে ঘরে ঘরে চরকা কাটা, তাঁতবোনা, বাড়ির গিন্নী থেকে চাকরবাকর দাসদাসী কেউ বাদ ছিল না। মা দেখি একদিন ঘড়ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন। মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আনিয়ে দিলেন। বাড়িতে তাঁত বসে গেল, খটাখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল। মনে পড়ে এই বাগানেই সুতো রোদে দেওয়া হত। ছোট ছোট গামছা ধুতি তৈরী করে মা আমাদের দিলেন—সেই ছোট ধুতি, হাঁটুর উপর উঠে যাচ্ছে, তাই পরে আমাদের উৎসাহ কত।

একদিন রাজেন মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরছি পল্লীসমিতির মিটিঙের পর, রাস্তার মোড়ে একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে সেলাম ক'রে হাতে পয়সা কিছু গুঁজে দিলে, বললে আজকের রোজগার। এক দিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে। মুটে-মজুরদের মধ্যেও কেমন একটা ভাব এসেছিল স্বদেশের জন্য কিছু কোরবার, কিছু দেবার।

রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব কোরতে হবে আমাদের, সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। উৎসবের মন্ত্র অনুষ্ঠান সব যোগাড় কোরতে হবে, তখন তো তোমাদের মতো আমাদের আর বিধুশেখর শাস্ত্রী ছিলেন না, ক্ষিতিমোহনবাবুও ছিলেন না, কিছু একটা হলেই মন্ত্র বাতলে দেবার। কী করি, থাকবার মধ্যে ছিলেন ক্ষেত্রমোহন কথক ঠাকুর, রোজ কথকতা করতেন আমাদের বাড়ি, কালো মোটাসোটা তিলভাণ্ডেশ্বরের মতো চেহারা। তাঁকে গিয়ে ধরলুম রাখীবন্ধন-উৎসবের একটা অনুষ্ঠান বাতলে দিতে হবে। তিনি

খুব খুশী ও উৎসাহী হয়ে উঠলেন, বললেন, এ আমি পাঁজিতে তুলে দেব, পাঁজির লোকদের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, এই রাখীবন্ধন-উৎসব পাঁজিতে থেকে যাবে। ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গার স্নান ক'রে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব—রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি-ঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি—হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে বললুম, নে সব কাপড়-জামা, নিয়ে চল্ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের গামছা নিয়ে চলল স্নানে, মুনিব-চাকর এক সঙ্গে সব স্নান হবে। রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার ছু ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে—মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহা ধুমধাম—যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিল সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক্, পুণ্য হউক্, পুণ্য হউক্ হে ভগবান।

এই গানটি সে সময়েই তৈরী হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারিদিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হল—সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল এক গাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম; অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিল তাদেরও রাখী পরানো হল। হাতের কাছে ছেলে মেয়ে যাকে পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বাদ পড়ছে না, সবাইকে রাখী পরানো হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে সে এক ব্যাপার। পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কি, ওরা যে মুসলমান! মুসলমানকে রাখী পরালে—এইবারে একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে।

আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চীৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন। হুকুম হল চলো সব। এইবারে বেগতিক— আমি ভাবলুম, গেলুম রে বাবা, মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখী পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না। সোজা এগিয়ে চললেন মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু, সুরেন, আরো সব ডাকাবুকো লোক।

এদিকে দীপুদাকে বাড়িতে এসে এই খবর দিলুম, বললুম কী কাণ্ড হয় দেখো। দীপুদা বললেন, এই রে, দিনুও গেছে। দারোয়ান, দারোয়ান, যা শিগগির, দেখ্ কী হল—বলে মহা চেঁচামেচি লাগিয়ে দিলেন। আমরা সব বসে ভাবছি, এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী কী হল সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে, বললে কী আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবী-টৌলবী যাদের পেলুম হাতে রাখী পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম, আর মারামারি! সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে—ওরা একটু হাসলে মাত্র।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। (ক) ভারতের ছবি কে এবং কখন আঁকিয়াছিলেন? (খ) 'স্বদেশী ভাণ্ডারে' কি কি জিনিস পাওয়া যাইত? (গ) কাহারা সেই সব জিনিস কিনিত? (ঘ) মাতৃ-ভাণ্ডারের টাকা কি ভাবে উঠানো হইয়াছিল? (ঙ) এই সবের পাণ্ডা কে ছিলেন? [২+২+১+২+১]

২। রাখীবন্ধন উৎসবে কি গান গাওয়া হইয়াছিল? গানটি কে রচনা করিয়াছিলেন? [১+১]

৩। 'একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে সেলাম করে হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিলে'—কাহাদের দিল? কেন দিল? [২+৩]

৪। 'রাখীবন্ধন উৎসব করতে হবে আমাদের'—কে কাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন? কিভাবে উৎসব করা হইয়াছিল? [১+১+৩]

৫। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক যে কোন একটির ব্যাখ্যা লিখ :** (ক) ছোটো ছোটো গামছা ধুতি....আমাদের উৎসাহ কত। (খ) তখন সব স্বদেশের কাজ···সাজসজ্জাও বদলে ফেললুম। [৫×২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

৬। **অর্থ লিখ :** হুকুম, পাণ্ডা, কথকঠাকুর, উৎসাহী, খুশী, আস্তাবল। [১×৬]

৭। **মৌখিক প্রশ্ন :** (ক) রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের কে হইতেন? (খ) বন্দেমাতরম্ কাহার লেখা? (গ) অবনীন্দ্রনাথের মাকে কে চরকা আনিয়া দিয়াছিলেন? (ঘ) 'বাংলার মাটি বাংলার জল' কবিতাটি কাহার লেখা? [১×৪]
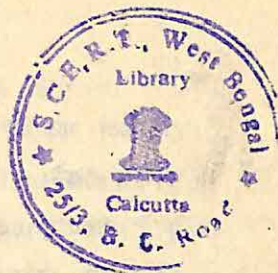
লালুর পাঁঠাবলি

শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
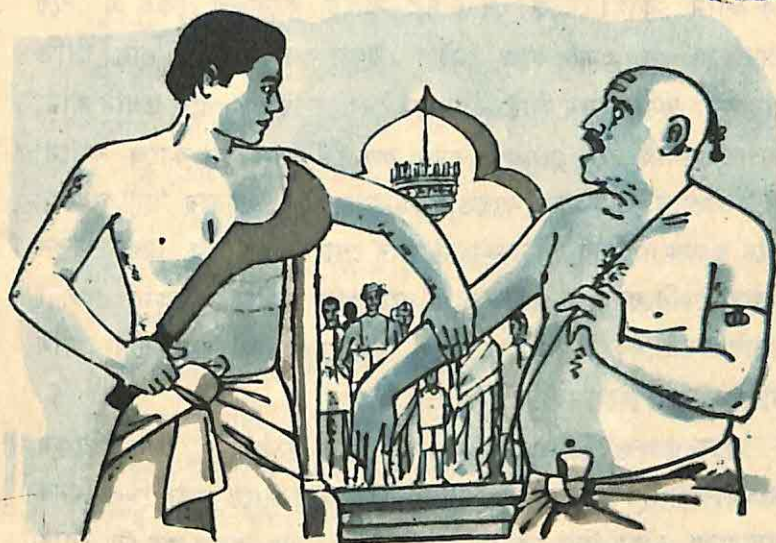
তার ডাক নাম ছিল লালু। ভাল নাম অবশ্য ছিলই, কিন্তু মনে নেই। জানো বোধ হয়, হিন্দীতে 'লাল' শব্দটির অর্থ হচ্ছে—প্রিয়। এ নাম কে তারে দিয়েছিল জানিনে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে নামের এমন সঙ্গতি কদাচিৎ মেলে। সে ছিল সকলের প্রিয়।

ইস্কুল ছেড়ে আমরা গিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম, লালু বললে, সে ব্যবসা করবে। মায়ের কাছে দশ টাকা চেয়ে নিয়ে সে ঠিকেদারি শুরু করে দিলে। আমরা বললাম, লালু তোমার পুঁজি ত দশ টাকা। সে হেসে বললে, আর কত চাই, এই ত ঢের।

সবাই তাকে ভালবাসতো; তার কাজ জুটে গেল। তারপর কলেজের পথে প্রায়ই দেখতে পেতাম, লালু ছাতি মাথায় কয়েকজন কুলি মজুর নিয়ে রাস্তার ছোটখাটো মেরামতির কাজে লেগেছে। আমাদের দেখে হেসে তামাশা করে বলতো—যা যা, দৌড়ো—পারসেণ্টেজের খাতায় এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

আরও ছোট কালে যখন আমরা বাঙলা ইস্কুলে পড়তাম তখন

সে ছিল সকলের মিস্ত্রী। তার বইয়ের থলির মধ্যে সর্বদাই মজুত থাকত একটা হামান্‌দিস্তার ডাঁটি, একটা নরুণ, একটা ভাঙ্গা ছুরি, ফুটো করবার একটা পুরনো তুরপুনের ফলা, একটা ঘোড়ার নাল,—কি জানি কোথা থেকে সে এ সব সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু এ দিয়ে পারত না সে এমন কাজ নেই। ইস্কুল শুদ্ধ সকলের ভাঙ্গা ছাতি সারানো, শ্লেটের ফ্রেম আঁটা, খেলতে খেলতে ছিঁড়ে গেলে তখনি জামা কাপড় সেলাই করে দেওয়া—এমন কত কি; কোনো কাজে কখনো না বলতো না। আর করতোও চমৎকার। একবার 'ছট্' পরবের দিনে কয়েক পয়সার রঙিন কাগজ আর শোলা কিনে কি একটা নতুন খেলনা তৈরি করে সে গঙ্গার ঘাটে বসে প্রায় আড়াই টাকার খেলনা বিক্রী করে ফেললে। তার থেকে আমাদের পেট ভরে চিনাবাদাম ভাজা খাইয়ে দিলে।

বছরের পর বছর যায়, সকলে বড় হয়ে উঠলাম। জিম্‌নাষ্টিকের আখড়ায় লালুর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তার গায়ে জোর ছিল যেমন অসাধারণ, সাহস ছিল তেমনি অপরিসীম। ভয় কারে কয় সে বোধ করি জানতো না। সকলের ডাকেই সে প্রস্তুত, সবার বিপদেই সে সকলের আগে এসে উপস্থিত। কেবল তার একটা মারাত্মক দোষ ছিল, কাউকে ভয় দেখাবার সুযোগ পেলে সে কিছুতে নিজেকে সামলাতে পারতো না। এতে ছেলে-বুড়ো-গুরুজন সবাই তার কাছে সমান। আমরা কেউ ভেবে পেতাম না, ভয় দেখাবার সব অদ্ভুত ফন্দি তার মাথায় এক নিমিষে কোথা থেকে আসে! দু-একটা ঘটনা বলি। পাড়ায় মনোহর চাটুজ্জের বাড়ী কালীপূজো। দুপুর রাতে বলির ক্ষণ বয়ে যায়, কিন্তু কামার অনুপস্থিত। লোক ছুটল ধরে আনতে, কিন্তু গিয়ে দেখে সে পেটের ব্যথায় অচেতন। ফিরে এসে সংবাদ দিতে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো,—উপায়? এত রাতে ঘাতক মিলবে কোথায়? দেবীর পূজো পণ্ড হয়ে যায় যে। কে একজন বললে, পাঁঠা কাটতে পারে লালু। এমন অনেক সে

কেটেছে। লোক দৌড়ালো তার কাছে, লালু ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলো, বললে—না।

না কি গো? দেবীর পূজোয় ব্যাঘাত ঘটলে সর্বনাশ হবে যে?

লালু বললে, হয় হোক্ গে। ছোটবেলায় ও কাজ করেছি কিন্তু এখন আর করব না।

যারা ডাকতে এসেছিল তারা মাথা কুটতে লাগলো, আর দশ-পনেরো **মিনিট** মাত্র সময়, তারপরে সব নষ্ট, সব শেষ। তখন মহাকালীর কোপে কেউ বাঁচবে না। লালুর বাবা এসে আদেশ দিলেন যেতে। বললেন, ওঁরা নিরুপায় হয়েই এসেছেন,—না গেলে অন্যায় হবে। তুমি যাও। সে আদেশ অমান্য করার সাধ্য লালুর নাই।

লালুকে দেখে চাটুজ্জে মশায়ের ভাবনা ঘুচলো। সময় নেই, তাড়াতাড়ি পাঁঠা উৎসর্গিত হয়ে কপালে সিন্দুর, গলায় জবার মালা পরে হাড়িকাঠে পড়লো, বাড়ীশুদ্ধ সকলের 'মা মা' রবের প্রচণ্ড চীৎকারে নিরুপায় নিরীহ জীবের শেষ আর্তকণ্ঠ কোথায় ডুবে গেল, লালুর হাতের খড়্গ নিমিষে উর্দ্ধোত্থিত হয়েই সজোরে নামলো, তারপরে বলির ছিন্নকণ্ঠ থেকে রক্তের ফোয়ারা কালো মাটি রাঙা করে দিলে। লালু ক্ষণকাল চোখ বুঁজে রইল। ঢাক ঢোল কাঁসির সংমিশ্রণে বলির বিরাট বাজনা থেমে এলো। ক্রমশঃ যে পাঁঠাটা অদূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল আবার তার কপালে চড়লো সিঁদুর, গলায় দুললো রাঙা মালা, আবার সেই হাড়িকাঠ, সেই ভয়ঙ্কর অন্তিম আবেদন, সেই বহুকণ্ঠের সম্মিলিত 'মা' 'মা' ধ্বনি। আবার লালুর রক্তমাখা খাঁড়া উপরে উঠে চক্ষের পলকে নীচে নেমে এলো,—পশুর দ্বিখণ্ডিত দেহটা ভূমিতলে বারকয়েক হাত পা আছড়ে কি জানি কাকে শেষ নালিশ জানিয়ে স্থির হলো, তার কাটা গলার রক্তধারা রাঙামাটি আরও খানিকটা রাঙ্গিয়ে দিলে।

ঢুলিরা উন্মাদের মতো ঢোল বাজাচ্ছে, উঠানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে বহুলোকের বহু প্রকারের কোলাহল; সুমুখের বারান্দায় কার্পেটের

আসনে বসে মনোহর চাটুজ্জে মুদিত নেত্রে ইষ্টনাম জপে রত, অকস্মাৎ লালু ভয়ঙ্কর একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। সমস্ত শব্দ-সাড়া গেল থেমে—সবাই বিস্ময়ে স্তব্ধ—এ আবার কি! লালুর অসম্ভব বিস্ফারিত চোখের তারা দুটো যেন ঘুরচে, চেঁচিয়ে বললে, আর পাঁঠা কই?

বাড়ীর কে একজন ভয়ে ভয়ে জবাব দিলে, আর ত পাঁঠা নেই। আমাদের শুধু দুটো করেই বলি হয়।

লালু তার হাতের রক্তমাখা খাঁড়াটা মাথার উপরে বার দুই ঘুরিয়ে ভীষণ কর্কশ কণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—নেই পাঁঠা, সে হবে না। আমার খুন চেপে গেছে—দাও পাঁঠা, নইলে আজ আমি যাকে পাব তাকে ধরে নরবলি দেব—মা মা—জয় কালী! বলেই একটা মস্ত লাফ দিয়ে সে হাড়িকাঠের এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে পড়লো। তার হাতের খাঁড়া তখন বন্ বন্ করে ঘুরছে। তখন যে কাণ্ড ঘটলো, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সবাই একসঙ্গে ছুটলো সদর দরজার দিকে, পাছে লালু ধরে ফেলে। পালাবার চেষ্টায় বিষম ঠেলাঠেলি হুড়োমুড়িতে সেখানে যেন দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার বেধে গেল। কেউ পড়েছে গড়িয়ে, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে কারও পায়ের ফাঁকের মধ্যে মাথা গলিয়ে বেরোবার চেষ্টা করছে, কারও গলা কারও বগলের চাপের মধ্যে পড়ে দম আটকাবার মতো হয়েছে, একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর দিয়ে পালাবার চেষ্টায় ভিড়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে, কিন্তু এসব মাত্র মুহূর্তের জন্য। তারপরেই সমস্ত ফাঁকা।

লালু গর্জে উঠলো—মনোহর চাটুজ্জে কই? পুরুত গেল কোথায়?

পুরুত রোগা লোক, সে গণ্ডগোলের সুযোগে আগেই গিয়ে লুকিয়েছে প্রতিমার আড়ালে। গুরুদেব কুশাসনে বসে চণ্ডীপাঠ করছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে—ঠাকুর দালানের একটা মোটা থামের পিছনে গা ঢাকা দিয়েছেন। কিন্তু বিপুলায়তন দেহ নিয়ে মনোহরের

পক্ষে ছুটাছুটি করা কঠিন। লালু এগিয়ে বাঁ হাতে তার একটা হাত চেপে ধরলে, বললে, চলো হাড়িকাঠে গিয়ে গলা দেবে।

একে তার বজ্রমুষ্টি, তাতে ডান হাতে খাঁড়া, ভয়ে চাটুজ্জের প্রাণ উড়ে গেল। কাঁদো কাঁদো গলায় মিনতি করতে লাগলেন, লালু! বাবা! স্থির হয়ে চেয়ে দেখ—আমি পাঁঠা নই, মানুষ। আমি সম্পর্কে তোমার জ্যাঠামশাই হই বাবা, তোমার বাবা আমার ছোট ভাইয়ের মতো।

—সে জানিনে। আমার খুন চেপেছে—চলো তোমাকে বলি দেব! মায়ের আদেশ!

চাটুজ্জে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—না বাবা, মায়ের আদেশ নয়, কখ্‌খনো নয়—মা যে জগজ্জননী।

লালু বললে—জগজ্জননী! সে জ্ঞান আছে তোমার? আর দেবে পাঁঠা বলি? ডেকে পাঠাবে আমাকে পাঁঠা কাটতে? বলো।

চাটুজ্জে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, কোন দিন নয় বাবা, আর কোন দিন নয়। মায়ের সুমুখে তিন সত্যি করছি, আজ থেকে আমার বাড়ীতে বলি বন্ধ।

—ঠিক ত?

—ঠিক বাবা ঠিক, আর কখনও না। আমার হাতটা ছেড়ে দাও বাবা, একবার পায়খানায় যাবো।

লালু হাত ছেড়ে দিয়ে বললে—আচ্ছা যাও, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পুরুত পালালো কোথা দিয়ে? গুরুদেব? সে কই? এই বলে সে পুনশ্চ একটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ মেরে ঠাকুর দালানের দিকে অগ্রসর হতেই প্রতিমার পিছন ও থামের আড়াল হতে দুই বিভিন্ন গলার ভয়ার্ত ক্রন্দন উঠলো। সরু ও মোটায় মিলিয়ে সে শব্দ এমন অদ্ভুত হাস্যকর যে লালু নিজেকে আর সামলাতে পারলে না। হাঃ হাঃ হাঃ—করে হেসে উঠে দুম্ করে মাটিতে খাঁড়াটা ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ী ছেড়ে পালালো।

তখন কারো বুঝতে বাকী রইল না খুন-চাপা টাপা সব মিথ্যে, সব তার চালাকি। লালু শয়তানি করে এতক্ষণ সবাইকে ভয় দেখাচ্ছিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে যে যেখানে পালিয়েছিল ফিরে এসে জুটলো। ঠাকুরের পূজো তখনো বাকি, তাতে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটেছে, এবং মহা হৈ চৈ কলরবের মধ্যে চ্যাটুজ্জেমশাই সকলের সম্মুখে বার বার প্রতিজ্ঞা করতে লাগলেন—ঐ বজ্জাত ছোঁড়াটাকে যদি না কাল সকালেই ওর বাপকে দিয়ে পঞ্চাশ ঘা জুতো খাওয়াই ত আমার নামই মনোহর চাটুজ্জে নয়।

কিন্তু জুতো তাকে খেতে হয় নি। ভোরে উঠে সে যে কোথায় পালালো সাত আট দিন কেউ তার খোঁজ পেল না। দিন সাতেক পরে একদিন অন্ধকারে লুকিয়ে মনোহর চাটুজ্জের বাড়ীতে ঢুকে তাঁর ক্ষমা এবং পায়ের ধুলো নিয়ে সে-যাত্রা লালু বাপের ক্রোধ থেকে নিস্তার পেলে। কিন্তু সে যাই হোক, দেবতার সামনে সত্য করেছিলেন বলে চাটুজ্জে বাড়ীর কালীপূজোয় তখন থেকে পাঁঠাবলি উঠে গেল।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। হিন্দী লাল কথার অর্থ কি? কোন্ কোন্ গুণের জন্য লালুকে তোমার ভাল লাগে? [১+৩]

২। লালুর বইয়ের থলির মধ্যে কি কি জিনিস থাকিত? উহা দিয়া সে কি করিত? [২+৩]

৩। মনোহর চাটুজ্জের পূজাবাড়িতে লালু যে ভাবে পাঁঠাবলি বন্ধ করিয়াছিল সেই গল্পটি নিজের মত করিয়া বল। [৮]

৪। লালুর পাঁঠাবলি গল্পটি হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি? [২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

৫। **বিষয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া যে কোন একটির বিশদ ব্যাখ্যা লিখ ঃ**

(ক) যা যা দৌড়ো……এখুনি ঢ্যারা পড়ে যাবে।

(খ) জগজ্জননী ! সে জ্ঞান আছে…আমাকে পাঁঠা কাটতে ? [৫ × ২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৬। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** জগজ্জননী, কুশাসন, পুনশ্চ, ভয়ার্ত। [১ × ৪]

৭। **যে কোন ৬টি শব্দের অর্থ লিখ ঃ** মেরামতির কাজ, কদাচিৎ মেলে, মজুত থাকত, সমকক্ষ, অপরিসীম, প্রস্তুত, অনুপস্থিত, উর্ধ্বোত্থিত, অন্তিম, উন্মাদ, কর্কশ, বজ্রমুষ্টি, নিস্তার পেলে। [১ × ৬]

৮। **যে কোন পাঁচটি শব্দ দ্বারা বাক্য রচনা কর ঃ** মেরামতি মজুত, প্রস্তুত, নালিশ, দক্ষযজ্ঞ, ডুকরে, বজ্জাত। [২ × ৫]

৯। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) লালু শব্দটি কোন শব্দ হইতে আসিয়াছে ? (খ) লালু কত টাকা মূলধন লইয়া ব্যবসা সুরু করিয়াছিল ? (গ) এই গল্পে কাহার বাড়ীতে কালীপূজা হওয়ার কথা বলা হইয়াছে ?

(ঘ) লালু বাবার ক্রোধ হইতে কি করিয়া রেহাই পাইল ?

[১+১+১+২=৫]
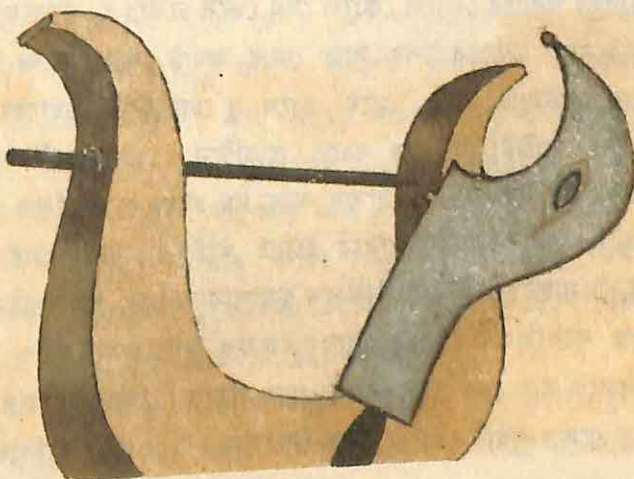
কেদারনাথের পথে

প্রবোধকুমার সান্যাল

আকাশ ঘন মেঘ ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার। শোনা গেল বৎসরে কোন কোন দিন মাত্র এ রাজ্যে সূর্যকিরণ দেখা যায়। সম্মুখে সাদা তুষারময় পর্বতের কোলে কোলে মেঘ ভেসে চলেচে। ঠাণ্ডায় পা ঠিক পড়চে না। দাঁতের উপর দাঁত চেপে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। ইচ্ছা করচে ছুটোছুটি করি। মুখে চোখে ছুঁচের মতো তুষারের হাওয়া বিঁধচে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে পারচিনে। গোলকধাঁধার মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠচি। বুকের মধ্যে দম আছে প্রচুর, কিন্তু পা ক্লান্ত হচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে আবার উঠতে থাকি। ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই, উৎসাহহীন নই, পিছনের পথ কুয়াশায় অবলুপ্ত, সম্মুখে হিমালয়ের অনন্ত কুহেলিকা, পথের ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে রয়েচে, ঝরণাগুলি সাবানের ফেনার মতো গলে পড়চে। আজ আমার শরীরে ফিরে এসেচে পুরাতন শক্তি, দুরন্ত উদ্দীপনা। কোথায় হারিয়ে গেচে

পিছনের পৃথিবী, কোথায় বিলীন হয়েচে আত্মীয় বন্ধুর দল—আজ আমি আর বিশ্রাম নেবো না, তুচ্ছ দেহের অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেবো না,—আজ বন্যার মতো অপ্রতিহত গতিতে ছুটে যাবো।

একবার দাঁড়ালাম। ছুটতে ছুটতে সকলকে পিছনে ফেলে এসেচি। চারিদিকে অকূল কুয়াশার মধ্যে কে কোথায় হারিয়ে গেচে, কেবল দেখা যাচ্ছে দুইদিকের সামান্য পথরেখা। কোথাও বৃক্ষলতা নেই, বন-অরণ্য নেই, জীব-জানোয়ারের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তুষারময় পর্বতমালা, অসংখ্য ঝরণা চীৎকার করতে করতে পথের ধারে নেমে আসচে। বামে দক্ষিণে সম্মুখে পিছনে মেঘের ঘনঘটা, বিলুপ্ত আকাশ, নিশ্চিহ্ন পৃথিবী। এবার চলচি হাতড়ে হাতড়ে; গর্জনমত্ত বায়ুবেগে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারচিনে।

ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হয়ে উঠলো। সে আলো আকাশের নয়, রৌদ্রের দীপ্তির নয়, বিদ্যুৎবহ্নির নয়—সে এক নতুন অলৌকিক আলো—তুষার শুভ্রতার তীব্র তীক্ষ্ণ আলো। আলোর স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোর ধাঁধা। চোখের দৃষ্টি উগ্র যন্ত্রণায় বুজে এল, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের মত সঙ্কীর্ণ পথরেখার উপরে পা বুলিয়ে বুলিয়ে হাঁটচি। সে কী ভয়ানক সর্বনাশা আলোর উগ্রতা, তীরের মতো চোখে এসে লাগে, যাত্রীরা পথভ্রষ্ট হয়ে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়। দেখতে দেখতে আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিল। উঠলো ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে শিউলি ফুলের মতো তুষার বৃষ্টি, তার সঙ্গে দানা দানা জল। কি কঠিন ঠাণ্ডা! আঃ আর বুঝি আত্মরক্ষা হলো না, আর কত দূর আছে কে জানে,—মন্দির আর কত দূরে? মাথার উপরে পড়চে বরফ, কাঁধে পড়চে বরফ, কম্বলটা বরফে সাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুলতে পারচিনে, পাগলের মতো ছোটবার চেষ্টা করলাম।

আঁক্! পড়লাম পা পিছলে বরফের উপর, পথ তুষারে ডুবে গেচে! একি, সত্যিই কি আমার শরীরে আর শক্তি নেই? শরীর

পাথরের মতো অসাড় হয়ে আসচে কেন? এ কোথায় ছিট্‌কে পড়েচি? হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কম্বলটা খুঁজে পেলাম। কত নীচে পড়েচি বোঝা গেল না, অনেক চেষ্টা করে চোখের পল্লব খুলে দেখি পাশেই একটা ছোট জলাশয় ঠাণ্ডায় জমে আয়নার কাচের মতো কঠিন হয়ে গেছে! গা-ঝাড়া দিয়ে আবার উঠলাম, মিছরির ঢিবির মতো বরফের স্তূপে পা পুঁতে গেচে। লাঠিটা আছে খাড়া দাঁড়িয়ে বরফের মধ্যে। যাক্ এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কোমর পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে উঠে পক্ষাঘাত হয়েচে, ঊর্ধ্ব দেহটা কেবল বাকি। নিজেকে টানতে টানতে এগোচ্চি, চোখ খুলতে পারলে দেখতাম আর কত দূরে! চোখেমুখে পড়েচে তুষার ও জলের বিন্দু, মাথার চুল ভারী হয়ে উঠচে, পরনের গৈরিকসজ্জা মোলায়েম তুষারে আচ্ছন্ন হলো। মিট্‌মিট্ করে একবার তাকাবার চেষ্টা করলাম। সম্মুখে তুষারের পুষ্পবৃষ্টি রূপার ঝালরের মতো ঝলমল করচে, মাথার উপরে তুষারের চন্দ্রাতপ। কী অনির্বচনীয় রূপগৌরব।

শঙ্খধ্বনি শুনচি। কাঁসর ঘণ্টার বুঝি আওয়াজ আসচে। কোন্ দিকে? উত্তরে, না দক্ষিণে? আবার কান পেতে শুনলাম। কিন্তু আর যে চলতে পারচিনে, একটিবার শুয়ে পড়ে বিশ্রাম নেবো? কিন্তু শুলেই যে থামতে হবে, অন্তিম মুহূর্তের থামা। হাত-পাগুলো আর কথা শুনতে চাইচে না।

মন্দাকিনী-দুধগঙ্গা পুলের কাছাকাছি এসে গেচি। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ অদূরে আবার শোনা গেল। দু'চারজন যাত্রী দূরে ছায়ার মতো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। পুল পার হয়েই সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের ঘর, দু'একটি দোকান, পথগুলি পাথর-বাঁধান। ঘর দুয়ার, দোকান পাট, পথ-ঘাট সমস্তই কঠিন বরফের স্তূপে ঢাকা। তার উপর দিয়েই আনাগোনা চলচে।

পথ ঘুরেই সম্মুখে তুষারময় হিমালয়ের পটভূমিকায় কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বেদিকার উপরে পথের দিকে

পিছন ফিরে বিরাট পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট। চোখে বরফের আলো এতক্ষণে একটু সয়ে গেচে। এবারে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরচে, পায়ের চামড়া ফেটে গেচে। তা যাক্, বাইরে পাদুকা ত্যাগ করে এই পরম রূপবান্ মন্দিরের ঘনান্ধকার অন্দরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম। ভিতরে জন কয়েক অর্ধ উন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষ যাত্রী কেদারনাথের বিপুল দেহের ওপর ওলোটপালট খাচ্চে। কেদারনাথ মূর্তিমান নন, কর্কশ অসমতল বড় একখানা পাথরের খণ্ড—তা হোক্, তাকেই আলিঙ্গন করে কেউ হাসচে, কেউ কাঁদচে, কেউ চীৎকার করচে, কেউ ধরেচে গান, কেউ করচে আর্তনাদ ও করুণ মিনতি, কেউ বা শীতবিদীর্ণ রক্তাক্ত মুখে তাকে পাগলের মতো চুম্বন করচে। উল্লাস, আর্তস্বর, পূজাপাঠ, স্তব-মন্ত্র, স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি ও আনন্দ—কিন্তু স্থাণু ও বধির প্রস্তর-স্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইল।

অন্ধকারের ভিতর থেকে পা বুলিয়ে বুলিয়ে দরজা দিয়ে বার হয়ে এলাম। হাত, পা, মুখ ঠাণ্ডায় বেঁকে যাচ্ছে, নেমে এসে কোনক্রমে জুতোজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে চললাম। হাতে লাঠি, তাকে চালনা করার আর শক্তি নেই, পায়ের তলায় বরফের চাপড়া-গুলিতে মচ্‌মচ্‌ করে শব্দ হচ্ছে, অন্ধকার থেকে তুষারের আলোয় নেমে আবার চোখ বুঁজে আসচে—তাড়াতাড়ি এসে ধর্মশালায় উঠলাম।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কেদারনাথের মন্দিরের নিকটে আসিয়া লেখকের শরীর ও মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? এখানকার যে দৃশ্যটি তিনি দেখিয়াছিলেন তাহা বর্ণনা কর। [৩+৩]

২। "সম্মুখে তুষারের পুষ্পবৃষ্টি রূপার ঝালরের মতো ঝলমল করচে, মাথার উপর তুষারের চন্দ্রাতপ। কী অনির্বচনীয় রূপগৌরব!"—লেখক কিসের বর্ণনা করিয়াছেন? সে রূপ অনির্বচনীয় কেন? [২+৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

৩। "কোথায় হারিয়ে গেচে পিছনের পৃথিবী, কোথায় বিলীন হয়েচে আত্মীয় বন্ধুর দল"—ব্যাখ্যা কর। [৬]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৪। **যে কোন ৬টি শব্দের অর্থ লিখ ঃ** তুষারময়, ছুঁচ, কুহেলিকা, উদ্দীপনা, অপ্রতিহত, নিশ্চিহ্ন, চন্দ্রাতপ, পথভ্রষ্ট, পক্ষাঘাত, অনির্বচনীয়, প্রস্তরময়, আর্তনাদ, ধর্মশালা। [১×৬]

৫। **বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে রূপান্তরিত কর ঃ** অভিযোগ, স্তূপ, মূর্তিমান, নীরবতা। [১×৪]

৬। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) কেদারনাথ ভারতের কোন অঞ্চলে? (খ) প্রস্তরময় বেদিকার উপর লেখক কি দেখিলেন? (গ) কেদারনাথের বিগ্রহ কিরূপ? [১×৩]

মহাশূন্যে মানুষের পদক্ষেপ

সুধাংশু শেখর গুপ্ত
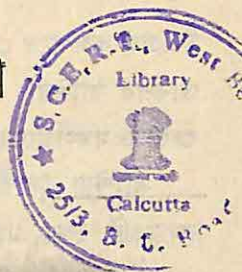
৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭ সাল। মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত একটি দিন। ঐদিন রাশিয়া ঘোষণা করেছিল—তাদের দেশ থেকে স্পুটনিক-১ নামে একটি নকল চাঁদ বা নকল উপগ্রহ, পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫০ মাইল ঊর্ধ্বে আকাশে এক কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে এবং সেটি চাঁদের মত পৃথিবীকে বেষ্টন করে ঘুরছে—ভূ-প্রদক্ষিণ করছে। এটি ওজনে ছিল ৮৩·৬ কিলোগ্রাম এবং ৯৫ মিনিটে একবার করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল। স্পুটনিক-১ বেতার যন্ত্রের সাহায্যে বহু মূল্যবান খবর পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল। ঠিক তিন মাস পরে, স্পুটনিক-১ পৃথিবীর ঘন বায়ুতে নেমে এসে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

এর ঠিক এক মাস পরে, রাশিয়া স্পুটনিক-২ উৎক্ষেপণ করে। এতে 'লাইকা' নামে একটি কুকুর আরোহী ছিল। জীবদেহের উপর উচ্চ বায়ুমণ্ডলের প্রভাব কি রকম হয় তা নির্ণয় করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। স্পুটনিক-২ বহুবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ভূতলে অবতরণ করে। কিন্তু লাইকা জীবন্ত ফেরেনি। রাশিয়ার প্রায় চারমাস পরে, তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আমেরিকাও মহাকাশ গবেষণার আসরে অবতীর্ণ হ'ল, এবং একস্প্লোরার-১ থেকে আরম্ভ করে বহু নকল

উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরণ করল। এ-সবই মহাকাশ-সন্ধানী অভিযান। তারপর রাশিয়া এবং আমেরিকা ক্রমে ক্রমে বহু রকেট যান চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গলগ্রহের অভিমুখে পাঠিয়েছে।

রাশিয়া 'লাইকা'-র পর 'বেল্‌কা' ও 'স্ট্রেলকা' নামে দুটি কুকুর, কয়েকটি ইঁদুর, মাছি এবং চারাগাছ মহাকাশে পাঠিয়েছিল। এরা শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিল, এবং বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বহন করে এনেছিল। আমেরিকাও একটা বানর মহাকাশে পাঠিয়েছিল, এবং সাফল্যের সঙ্গে জীবন্ত ফিরিয়ে এনেছিল। এ সবই কিন্তু মানুষের মহাকাশে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি। কারণ সেই সুদূর মহাশূন্যে অক্সিজেন নেই, দেহের ভার থাকে না, নানা বিষাক্ত আলোর রশ্মি আছে—এর জন্য নিরাপত্তার সব রকম ব্যবস্থা নিয়েই তবে মানুষ মহাকাশের পথে পা বাড়িয়েছে।

রাশিয়া আবার নতুন বিস্ময় নিয়ে এল ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল। রাশিয়া সর্বপ্রথম মহাকাশে মানব অভিযাত্রী পাঠাল—আর ঐতিহাসিক মানুষটির নাম ইউরী গ্যাগারিন। ভস্টক-১ নামক রকেট যানে আরোহণ করে তিনি ১০৮ মিনিটে একবারের একটু বেশী পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে নিরাপদে ভূতলে নেমে এলেন। মহাকাশযান থেকে দেখলেন—মহাকাশে ঘোর অন্ধকার, প্রদীপ্ত সূর্য আকাশে থাকা সত্ত্বেও উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রকাশমান। এর অল্প দিনের মধ্যে আমেরিকাও মহাকাশযানে মানবারোহী পাঠাল। এখন আর স্বয়ং-ক্রিয় যন্ত্রপাতি নয়, মানুষ স্বচক্ষে সব দেখে এমন সব ছবি, মানচিত্র, তথ্যাদি সংগ্রহ করে আনল যা অমূল্য। এই দু'টি উন্নত সম্পদশালী দেশের সুস্থ প্রতিযোগিতায় রাশিয়া আবার এক টেক্কা মারল মহাশূন্যে নারী অভিযাত্রী পাঠিয়ে। ১৯৬৩ সালের জুন মাসে শ্রীমতী ভেলেনটিনা টেরসকোভা মহাকাশে আটচল্লিশ বার ভূ-প্রদক্ষিণ করে নির্বিঘ্নে এবং নিরাপদে ভূতলে প্রত্যাবর্তন করলেন। উভয় দেশেই, একাধিক নভশ্চারী মহাকাশে যাত্রা করেছেন, যান থেকে বেরিয়ে এসে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করেছেন, কত রকমারি কৃতিত্ব-কৌশল প্রদর্শন করে কত তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করেছেন—সে-সব বিচিত্র কাহিনী। শেষ পর্যায়ে,

আমেরিকা কি করে রোমাঞ্চকর কৃতিত্ব দেখিয়ে বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেই কাহিনীই বলছি।

চাঁদকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও আমেরিকা ১৯৫৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বহু আরোহীবিহীন রকেট যান পাঠিয়েছে। অনেকগুলি চাঁদের পাশ কাটিয়ে মহাশূন্যে হারিয়ে গেছে। চন্দ্র সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহই ছিল এর উদ্দেশ্য। রকেট যানের শীর্ষে সংলগ্ন যন্ত্রাগার থেকে চাঁদের পিঠের কত আলোকচিত্র – টেলিভিসন ছবি যে পাওয়া গেছে তার শেষ নেই। এরই শেষ অধ্যায়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রাশিয়া পথিকৃৎ-এর গৌরব দাবী করতে পারে। প্রথম নকল উপগ্রহ সেই পাঠিয়েছিল। মহাকাশে জীবজন্তু ও মানুষ পাঠিয়েছে রাশিয়া-ই প্রথম এবং প্রথম নভশ্চারিণীও সেই রাশিয়ার মেয়ে। কিন্তু একটি দিক দিয়ে আমেরিকা রাশিয়াকে ছাড়িয়ে গেছে। চন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করার এবং চন্দ্রপৃষ্ঠে মানুষের প্রথম পদার্পণের যে গৌরব তা আমেরিকার।

১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই কেপ কেনেডি থেকে স্যাটার্ন-৫ রকেট বাহিত অ্যাপোলো-১১ নামক মহাকাশযানে যাত্রা করলেন তিনজন অভিযাত্রী—নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন আলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স্। ২০শে জুলাই মধ্যরাত্রে চন্দ্রে পদার্পণ করলেন আর্মস্ট্রং এবং আলড্রিন। কলিন্স্ রইলেন মূল যানে। এই যানে 'ঈগল' নামে একটি অংশ ছিল। সেইটিই আসল চন্দ্রযান—যাতে করে আর্মস্ট্রং ও আলড্রিন চাঁদে নামলেন পূর্ব নির্বাচিত শান্তি-সাগর এলাকায়। ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই তারিখটি মানব সভ্যতার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। এইভাবে মহাকাশ জয়ের বারো বছরের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার এক অধ্যায় শেষ হল। চাঁদে নেমে এঁরা খুঁড়ে খুঁড়ে চন্দ্র-পৃষ্ঠের মাটি, বিচিত্র বর্ণের সব পাথর সংগ্রহ করলেন। মায়েরা যে চাঁদকে ছেলের কপালে 'টি' দেবার জন্যে হাতছানি দিয়ে চিরকাল ডেকে এসেছেন, এঁরা সেই চাঁদের কপালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার টিপ পরিয়ে এলেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে রাশিয়ার কৃতিত্ব কি কি কারণে ? [৪]

২। মহাকাশ-গবেষণার শেষ অধ্যায়ে আমেরিকা রাশিয়াকে ছাড়াইয়া গিয়াছে—ইহা মনে করিবার কারণ কি ?—বুঝাইয়া দাও। [৫]

৩। ১৯৬৯ সালে ২০শে জুলাই স্মরণীয় কেন ? [২]

ব্যাখ্যাগত প্রশ্ন ঃ

৪। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক যে কোন একটির ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) মহাকাশের ঘোর অন্ধকার.......নক্ষত্র প্রকাশমান।

(খ) মায়েরা যে চাঁদকে ছেলের কপালে···পরিয়ে দিয়ে এলেন। [৫×২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৫। **যে কোন পাঁচটি শব্দের লিঙ্গান্তর কর ঃ** কুকুর, বানর, মানব, নভশ্চারী, মেয়ে, অভিযাত্রী, অবিস্মরণীয়। [১×৫]

৬। **যে কোন ৬টি শব্দের অর্থ লিখ ঃ** চাঁদ, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, পা, মানুষ, সূর্য, সাগর, মাটি, পাথর। [১×৬]

৭। নিম্নোক্ত একবচন বা বহুবচনের চারটি শব্দকে বিপরীত বচনে রূপান্তরিত কর ঃ

উপগ্রহ, খবর, ইঁদুর, তথ্যাদি, মায়েরা, নভশ্চারী। [১×৪]

৮। **বাক্য গঠন কর ঃ** মহাকাশ, উৎক্ষেপণ, নভশ্চারী, অভিযান, পথিকৃৎ। [২×৫]

৯। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) যে প্রাণীটি প্রথম মহাকাশে গিয়াছিল তাহার নাম কি ? (খ) প্রথম নারী ও পুরুষ অভিযাত্রীর নাম কি ? (গ) চন্দ্রপৃষ্ঠে কে বা কাহারা প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন ? (ঘ) চন্দ্রাভিযানের ক্ষেত্রে 'ঈগল' বলিতে কি বুঝাইতেছে ? [১×৪]

আমাদের জাতীয় পতাকা

সুবোধ সেনগুপ্ত

আমাদের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা আমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছি ; বিশেষ করিয়া ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসে এবং ২৬শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবসে বিদ্যালয়ের উৎসবে, প্রধান শিক্ষক মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন তখনও দেখিয়াছি। জাতীয় পতাকা সামান্য রঙিন বস্ত্রখণ্ডমাত্র নয়। ইহা জাতির আশা, আদর্শ, ঐতিহ্য, সম্মান এবং গৌরবের প্রতীক। আমরা যে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র, কাহারও অধীন নহি, জাতীয় পতাকা তাহাই ঘোষণা করে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, আমেরিকা, চীন, রাশিয়া প্রভৃতি প্রতিটি স্বাধীন দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পতাকা আছে। ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকাকে 'ইউনিয়ন জ্যাক' বলে। প্রত্যেক দেশের লোকই নিজেদের জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকে। আমাদের দেশেও

অসংখ্য শহীদ স্বাধীনতার পরিচয়-বাহী এই পতাকা লাভ করিবার জন্য এবং ইহার গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের আত্মত্যাগের ফলেই স্বাধীনতা এবং উহার প্রতীকচিহ্নস্বরূপ এই পতাকা আমরা অর্জন করিয়াছি।

আমাদের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের একটি ইতিহাস আছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে আমরা ছিলাম পরাধীন। আমাদের দেশ তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমরা ইংরাজের অধীন ছিলাম। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য আমাদিগকে দীর্ঘকাল ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে স্বাধীনতার প্রতীক বা চিহ্ন হিসাবে আমাদের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা করা হয়।

স্বাধীনতা লাভের সংকল্প ঘোষণা করিয়া ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ই আগস্ট সর্বপ্রথম কলিকাতার পার্শীবাগান উদ্যানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই পতাকা আড়াআড়িভাবে পর পর – প্রথমে লাল, পরে হলুদ এবং সর্বশেষে সবুজ—এই ত্রিবর্ণে মণ্ডিত ছিল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট মাদাম কামা, একটি সভায়, তাঁহার উদ্ভাবিত ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন প্যারিসে মতান্তরে জার্মানীতে। এটিও ছিল প্রায় প্রথমোক্ত পতাকাটির অনুরূপ। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে আর একটি ত্রিবর্ণ পভাকা প্রস্তুত করেন মহাত্মা গান্ধী —ইহার ত্রিবর্ণের মধ্যবর্তী সাদার উপরে ছিল চরকার ছাপ। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, দেশের পক্ষ হইতে, আনুষ্ঠানিকভাবে একটি জাতীয় পতাকা গ্রহণ করেন। ইহার উপরে গাঢ় জাফরান রঙ, মাঝখানে সাদার উপরে চরকা চিহ্ন, এবং নিচে ঘোর সবুজ বর্ণ। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের সময় যে ত্রিবর্ণ পতাকা আইনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় – সেটি আগেরটির মতই, শুধু মাঝখানে, চরকার পরিবর্তে অশোক-চক্র মুদ্রিত হইল। ইহাই আজ স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা। একটি কথা মনে রাখিতে হইবে

যে জাতীয় পতাকার এই তিনটি রঙের তাৎপর্য বা অর্থ আছে। গাঢ় জাফ্‌রান রঙ সাহস ও আত্মত্যাগের, সাদা রঙ সত্য ও শান্তির এবং সবুজ রঙটি আত্মবিশ্বাস ও বীর্যের প্রতীক।

আজ একথা স্মরণ করিয়া কৌতুকবোধ করি যে, স্বাধীনতার পূর্বযুগে - তখনকার পরিকল্পিত পতাকা সম্মুখে রাখিয়া আমরা যখন ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতাম, তখন প্রবল প্রতাপ-শালী ইংরাজের রাজকর্মচারীদের, বিশেষ করিয়া পুলিশের মুখ ভয়ে শুকাইয়া যাইত। কারণ, এই পতাকার সেবক শহীদগণ ছিলেন পরম নির্ভীক এবং বেপরোয়া। আর আজ, স্বাধীনতার পরে সমস্ত পৃথিবী আমাদের জাতীয় পতাকাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। কারণ, এই পতাকা ঘোষণা করে, আমরা পররাজ্যলোলুপ নহি—আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা চাই।

পুণ্য, পবিত্র, শত শহীদের রক্তপূত আমাদের এই জাতীয় পতাকা কিন্তু, যখন-তখন, যেমন-তেমনভাবে ব্যবহার করা যায় না। ইহার ব্যবহারের নিয়ম ও পদ্ধতি আছে। প্রতিদিন এই পতাকা শুধু সরকারী অফিস, আদালত, পৌরপ্রতিষ্ঠানের ভবনশীর্ষে উড্ডীন থাকিবে। কেবল স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উৎসবের দিনে জনসাধারণ ইহা ব্যবহার করিতে পারেন—এবং তাহারও কতকগুলি নিয়ম আছে। আমরা বড় হইয়া, আমাদের নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথ পালন করিয়া, এই জাতীয় পতাকার গৌরব বর্ধন করিব—এই শপথ আমরা গ্রহণ করিব।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। (ক) আমাদের জাতীয় পতাকার যে তিনটি রঙ দেখা যায়, সেই তিনটি রঙ কি কি ভাব প্রকাশ করিতেছে ?

(খ) বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা তোমরা কখন উত্তোলন কর ? [৩+২]

২। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকার বিশেষ নামটি কি ? [১]

৩। আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা কি ঘোষণা করে ? [১]

৪। পরাধীন যুগ হইতে আমাদের জাতীয় পতাকার ক্রমবিকাশের ইতিহাসটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [৮]

৫। আমাদের জাতীয় পতাকা ব্যবহারের কিরূপ নিয়ম আছে? [৪]

ব্যাখ্যাগত প্রশ্ন ঃ

৬। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক একটির ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) জাতীয় পতাকা সামান্য রঙিন....এবং গৌরবের প্রতীক।

(খ) জাতীয় পতাকার এই তিনটি···তাৎপর্য বা অর্থ আছে। [৫ × ২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৭। **যে কোন চারটি শব্দের অর্থ লিখ ঃ** প্রতীক, শহীদ, আত্মত্যাগ, রক্তপূত, গৌরবার্জন, পররাজ্যলোলুপ। [১ × ৪]

৮। **যে কোন পাঁচটি শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন কর ঃ** পতাকা উত্তোলন, প্রাণ বিসর্জন, অন্তর্ভুক্ত, পুণ্য, কাম্য, শান্তি প্রতিষ্ঠা। [২ × ৫]

৯। **উল্লিখিত তিনটি বিষয় সম্বন্ধে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ ঃ** মাদাম কামা, মহাত্মা গান্ধী, অশোক-চক্র, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি, প্রজাতন্ত্র দিবস। [৩ × ৩]

১০। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) আমাদের জাতীয় পতাকার কয়টি রঙ এবং কি কি? (খ) জাতীয় পতাকার মাঝখানে কি আছে? (গ) ভারতবর্ষ কবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল? (ঘ) পরাধীনতার যুগে কোথায় এবং কবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল? [১ × ৪]
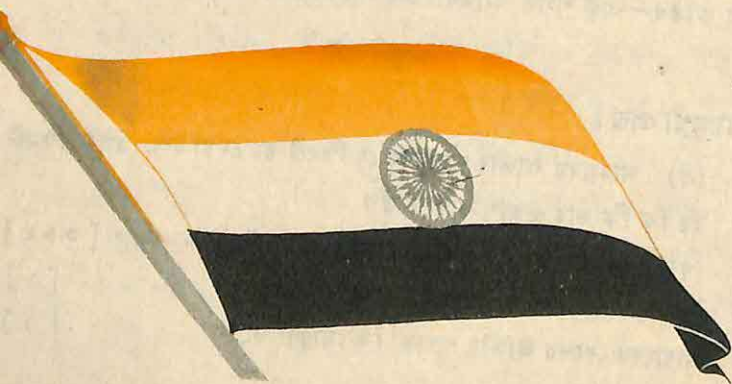
স্বামী বিবেকানন্দ

বীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী

নব-জাগৃতির আলোকে উজ্জ্বল স্বর্ণপ্রসূ উনবিংশ শতকে বিবেকানন্দের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে দেশ যখন মোহাচ্ছন্ন, রামকৃষ্ণ-স্নেহধন্য স্বামীজী তখন তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং মনীষা দ্বারা এক মহত্তর জীবনের পথে দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

কলিকাতার সিমুলিয়ায় বিখ্যাত দত্ত বংশে ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন বিখ্যাত উকিল। পিতৃদত্ত নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ। মাতা ভুবনেশ্বরীর আদরের নাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে। বাল্যে তাঁহার চরিত্র গঠনে পিতার ব্যক্তিত্ব ও উদারতা এবং মাতার গভীর ধর্মনিষ্ঠা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বিদ্যাসাগর বর্ণিত 'সুবোধ বালক' তিনি কখনই ছিলেন না। পরন্তু ক্রীড়া প্রাঙ্গণে তিনি ছিলেন দলপতি। অত্যন্ত দুঃসাহসের প্রয়োজন যে খেলায়, তাহাতেই ছিল তাঁহার অধিকতর অনুরাগ। স্বাস্থ্যচর্চ্চার দিকে ছিল বিশেষ ঝোঁক। ইহারই পাশাপাশি সঙ্গীতের

প্রতিও ছিল তাঁহার তীব্র আকর্ষণ। পরিশ্রমী ও তীক্ষ্ণধী ছাত্র হিসাবে স্কুল ও কলেজে তিনি খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। জ্ঞানার্জনে নরেন্দ্রনাথের গভীর অভিনিবেশ ছিল।

শৈশবেই ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ দেখা যায়। কলেজে অধ্যয়নকালে ধর্ম-পিপাসা তাঁহার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। এইজন্য তিনি বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করেন এবং তদানীন্তন বহু স্বনামধন্য মনীষীর নিকট যাতায়াত করেন। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু কেহই তাঁহার এই ধর্ম-পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। এই সময়ে ধর্ম-জিজ্ঞাসায় চঞ্চল মন লইয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরের সিদ্ধ-পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সংস্পর্শে আসেন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর ও যুক্তিসিদ্ধ উপদেশে তাঁহার চিত্ত শান্ত হয়।

একুশ বৎসর বয়সে নরেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হইলেন। পিতার মৃত্যুতে সংসারের দায়িত্ব পুরাপুরি তাঁহার উপর আসিয়া পড়িল। নরেন্দ্রনাথ তখন আইনের ছাত্র। ছাত্রজীবনে ইতি টানিয়া তিনি অর্থোপার্জনে উদ্যোগী হইলেন। সংসার-জীবনে নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতা হইল তাঁহার নিত্যসঙ্গী। কিছুকাল পর তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন, গ্রহণ করেন তাঁহার শিষ্যত্ব। প্রধান শিষ্যরূপে তাঁহার নাম হইল স্বামী বিবেকানন্দ।

কয়েক বৎসর পরেই ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধান হইল। বিবেকানন্দ সুদীর্ঘ তপস্যার জন্য সন্ন্যাসীর বেশে নানা দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন। গৈরিক বস্ত্র পরিহিত দণ্ড-কমণ্ডলুপাণি বিবেকানন্দ দিনের পর দিন নগর-পল্লী-অরণ্য-বেষ্টিত এই বিশাল ভারতভূমি পর্যটন করিলেন। অভ্রভেদী হিমালয়ের তুষারক্ষেত্র, সমতলের শ্যামল পল্লীভূমি, উত্তর ভারতের শুষ্ক মরুভূমি হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত যে বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষ, তাহাকে আপন সত্তা দিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। আপামর জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ভারত ও ভারতবাসী সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ

করিয়াছিলেন। এই সময়েই বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই পরিব্রাজক অবস্থায় তিনি উপলব্ধি করিলেন, দেশ আজ দরিদ্র, দেশবাসী অন্নহীন, প্রাণহীন, স্বাস্থ্যহীন। প্রধানতঃ আত্মবিশ্বাস হারাইয়াই আজ ভারতবাসী এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। জনৈক শিষ্যকে তিনি বলিয়াছিলেন, "যে-দেশে ভীষ্ম-দ্রোণাদির ন্যায় বীর, অর্জুনের ন্যায় শিষ্য, ভরত-লক্ষ্মণের ন্যায় অনুজ এবং যুধিষ্ঠিরাদির ন্যায় ধর্মশীল নৃপতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আজ সে দেশের লোক কাপুরুষতার কলঙ্কভার মস্তকে বহন করিতেছে। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আজ সকলের মনে এই বিশ্বাস জাগাইতে হইবে যে আমরা একটা মহাজাতির বংশধর, যদি আমরা আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রাখি তাহা হইলে আমরা আবার মহীয়ান হইয়া উঠিতে পারিব।"

এই সময়ে, ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে আমেরিকার শিকাগো শহরে এক ধর্ম-মহাসভা হয়। এই সম্মেলনে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা দেন তাহাতে ভারতের ধর্মমত ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিদেশীর শ্রদ্ধা বহুগুণ বর্ধিত হয়। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে দলে দলে বহু আমেরিকান ও ইউরোপীয়ান তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভগিনী নিবেদিতা, যাঁহাকে আমরা আজিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

দেশে ফিরিয়া তিনি সন্ন্যাসীদের জন্য কলিকাতার সন্নিকটে বেলুড় নামক স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিলেন। নিষ্কাম কর্মযোগ ও মানবসেবাই ছিল তাঁহার মূল আদর্শ। দরিদ্রের প্রতি ছিল তাঁহার সুগভীর মমতা। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' —ইহাই ছিল বিবেকানন্দের মূল বাণী। তিনি বলিলেন, "পরের জন্য প্রাণ দিতে, বিধবার অশ্রু মুছাইতে, পুত্র-বিয়োগ-বিধুরের প্রাণে শান্তি দান করিতে, অজ্ঞ জনসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিতে এবং জ্ঞানালোক দিয়া সমাজ হইতে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেই জগতে সন্ন্যাসীর সৃষ্টি হইয়াছে।" তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা

করিলেন, "যদি জগতের দুঃখ নিবারণের জন্য, এমন কি একটি মাত্র মানবের দুঃখ লাঘবের জন্যও আমাকে সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।" তিনি সন্ন্যাসিগণকে একবার বলিয়াছিলেন, "সকল জাতির দীন-দুঃখী—তাহারাই আমার দেবতা, তাহারাই আমার ভগবান, আমি যেন তাহাদেরই সেবা করিতে পারি।" তিনি 'রামকৃষ্ণ মিশন' নামে একটি সেবা-ধর্মের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। আজ পৃথিবীর বহু জায়গাতেই এই প্রতিষ্ঠান ছড়াইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সম্পর্কে বিবেকানন্দ যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, সেইগুলি পাঠ করিলে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা ও আদর্শ সম্পর্কে আমরা জানিতে পারিব। তিনি বুঝিয়াছিলেন ভারতে যতদিন উচ্চ-নীচ ভেদ থাকিবে, জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা থাকিবে, ততদিন ভারতের উন্নতি নাই; তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন, "হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই·······বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ: আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও····আমায় মানুষ কর।"

বাংলা সাহিত্যে কথ্য-ভাষার সফল প্রয়োগের তিনি অন্যতম প্রচারক। তাঁহার লেখা বাংলা ও ইংরেজী রচনাবলী বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

সর্বসাধারণের মঙ্গল কামনার যে শুভপথ, সেই পথেরই পথিক ছিলেন এই বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার পবিত্র আত্মা আজিও আমাদের মহাজীবনের পথে অনুপ্রাণিত করে। তাঁহার বলিষ্ঠ বাণী এই জীবনে আমাদের চলিবার পথের প্রধান পাথেয়। আমরা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি,—আমাদের মানুষ কর, আমাদের পথ দেখাও, আমাদের আলো দাও।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ছাত্র হিসাবে বিবেকানন্দ কিরূপ ছিলেন? খেলাধূলার প্রতি তাঁহার কিরূপ আকর্ষণ ছিল? [১+১]

২। নরেন্দ্রনাথের বিবেকানন্দ নাম কখন এবং কি ভাবে হইল? [১+২]

৩। পরিব্রাজকরূপে বিবেকানন্দ কিরূপে ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন? [৫]

৪। কোন্ ধর্ম সম্মেলনে বিবেকানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন? [১]

৫। বিবেকানন্দের সন্ন্যাসের আদর্শ কি ছিল? [৫]

৬। জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে বিবেকানন্দের কিরূপ মনোভাব ছিল। [৪]

ব্যাখ্যাগত প্রশ্ন ঃ

৭। **যে কোন দুটির ভাবার্থ লিখ ঃ**

(ক) "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

(খ) "বল—মূর্খ ভারতবাসী……আমার ভাই।"

(গ) "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও……আমায় মানুষ কর।" [৫×২]

৮। **ইঁহাদের মধ্যে যে কোন তিন জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ঃ**
ভীষ্ম, দ্রোণ, অর্জুন, ভরত, এবং যুধিষ্ঠির। [৩×৩]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৯। **যে কোন ৪টি শব্দের পদান্তর কর ঃ**
অবসন্ন, কল্যাণ, চঞ্চল, আকাঙ্ক্ষা. মধুর, দারিদ্র্য, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা। [১×৪]

১০। **যে কোন পাঁচটি শব্দের অর্থ লিখ ঃ** অভিনিবেশ, দুঃসাহস, নিবিড়, গৈরিক, বস্ত্র, তিরোধান হইল, কাপুরুষতা, ধর্মশীল, গৌরীনাথ, জগদম্বে। [১×৫]

১১। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম কি? (খ) বিবেকানন্দের পিতা ও মাতার নাম কর। (গ) কত বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হইয়াছিলেন? (ঘ) তিনি কাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন?
(ঙ) আমেরিকায় ধর্ম-মহাসভা কোন্ শহরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল?
(চ) অস্পৃশ্যতা কাহাকে বলে? [১×৬]

বাঙালীর আবিষ্কার

শেতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকে বলেন, বাঙালীদের মধ্যে রক্ষণশীলতা কম। অর্থাৎ বাঙালীরা পুরাতন সংস্কার, রীতি-নীতি আঁকড়াইয়া থাকিতে ভালবাসে না, সহজে এবং উদারভাবে নূতনকে গ্রহণ করিতে পারে। সেইজন্য, সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙলা দেশই পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতাকে প্রথম স্বাগত জানাইয়াছিল এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও অনুশীলনে অগ্রণী হইতে পারিয়াছিল। ইহার ফল হইয়াছিল এই — গত উনবিংশ শতাব্দীতে এই বাঙলা দেশে অনেক বড় বড় মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহারা বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে নানা দিক দিয়া সমৃদ্ধ করিয়া, একদিকে যেমন অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের জন্য একটি গৌরবময় আসন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কী শিল্পে সাহিত্যে, কী দার্শনিক ভাবনা-ধর্ম চিন্তায় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে, ইহাদের অবদান অবিস্মরণীয় হইয়া আছে। এখানে আমরা এমন দুইজন বাঙালী মনীষীর কথা বলিব, যাঁহাদের মধ্যে একজন জীববিদ্যার ক্ষেত্রে এবং অন্যজন চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী আবিকার করিয়াছেন।

প্রথমেই বলি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কথা। আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি-ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন গাছপালারও প্রাণ আছে— উহারা জড়পদার্থ নহে। সেইজন্য মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাঁহারা পুষ্প-

পত্র চয়ন করিতেন। বট-অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষদেবতার পূজা করিতেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র আর্য-ঋষিদের কথা বিশ্বাস করিতেন, এবং এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ইহার সত্যতা তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন। এই বিজ্ঞান-সাধক বহু বৎসর ধরিয়া গাছ-পালা লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া 'ক্রেস্‌কোগ্রাফ' নামে এমন একটি যন্ত্র স্বহস্তে নির্মাণ করিয়াছিলেন যাহার দ্বারা তিনি হাতে-কলমে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে উদ্ভিদ্ প্রাণীদের মতই প্রাণবন্ত এবং অনুভূতিশীল। যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দেখাইয়াছেন—কেমন করিয়া একটি চারাগাছ বৃদ্ধি পায়, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং আহার গ্রহণ করে—আবার বিদ্যুৎ-প্রয়োগে উত্তেজনায় কম্পিত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি আরও দেখাইয়াছেন—বিষপ্রয়োগে উদ্ভিদের হৃৎস্পন্দন ক্রমশঃ স্তিমিত হইয়া আসে এবং উহার মৃত্যু হয়। আবার উত্তেজক ঔষধের প্রয়োগে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়। এইভাবে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন উদ্ভিদ্ শুধু জীবন্ত নহে, উহাদের স্নায়ুজাল প্রাণীদেরই মত। স্নায়ুই জীবদেহে অনুভূতি-শক্তির মূল।

জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এতো বড় আবিষ্কার ইহার পূর্বে আর হয় নাই। বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজ তাঁহার ক্রেস্‌কোগ্রাফ্ যন্ত্রের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেলেন। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাঁহারা নূতন দৃষ্টিলাভ করিলেন। তাঁহার আবিষ্কারের তত্ত্বপ্রচারের উদ্দেশ্যে আচার্য বসু একাধিক বার ইয়োরোপে ও আমেরিকায় গিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র ক্রেস্‌কোগ্রাফ ছাড়া শব্দ-তরঙ্গ, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ লইয়াও গবেষণা করিয়াছেন। ১৮৯৪-৯৫ সালে ইনি কলিকাতা টাউন হলে বাঙলার গভর্নরের উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। ১৮৯৬ সালে লিভারপুলের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের একটি বিশেষ অধিবেশনে তিনি বৈদ্যুতিক রশ্মি-সম্বন্ধীয় তাঁহার যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাদি দেখান। সুতরাং বেতারে সংবাদ প্রেরণ-কৌশল তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন

—যদিও অজ্ঞাত কারণে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনি ইহার আবিষ্কর্তা রূপে খ্যাতিলাভ করেন।

দেশবিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ উপাধি দান করিয়া সম্মানিত করেন। তদানীন্তন ইংরাজ সরকার ১৯১৭ সালে তাঁহাকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করেন।

স্যার জগদীশচন্দ্র ১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর কলিকাতায় আপার সার্কুলার রোডের উপরে এক আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার স্থাপন করেন। উহার নাম 'বসু বিজ্ঞান মন্দির।'

ব্যাধির বিরুদ্ধে যুগ যুগ ধরিয়া মানুষের অভিযান চলিয়াছে। সেই অভিযানের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইন' আবিষ্কার। এখন আমরা আর কালাজ্বরের কথা শুনি না। অথচ, ১৯২২ সালের আগে, এই ভারতবর্ষে—বিশেষ করিয়া বাংলা, বিহার, আসামের ঘরে ঘরে করুণ আর্তরোল উঠিয়াছিল এই কালব্যাধির আতঙ্কে। লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ সেদিন প্রাণ হারাইয়াছে এই দুর্জয় জ্বরের প্রকোপে। নানা দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা আগাইয়া আসিয়াছিলেন ইহার প্রতিকারের সন্ধানে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। অবশেষে প্রথম অভয়বাণী উচ্চারণ করিলেন জনৈক বাঙালী চিকিৎসক ও বিজ্ঞান-সাধক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। তখন তিনি কলিকাতার ক্যামবেল হাসপাতালে (এখনকার নীলরতন সরকার হাসপাতাল) কাজ করিতেন। কালাজ্বর বিভাগের মৃত্যুপথযাত্রীদের যন্ত্রণা-কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অবশেষে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কঠোর পরিশ্রম করিয়া ১৯২২ সালে কালা-জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ আবিষ্কার করিলেন—ইউরিয়া ষ্টিবামাইন।

উপেন্দ্রনাথ অতিশয় মেধাবী এবং কৃতী ছাত্র ছিলেন। সমস্ত উচ্চ ও উচ্চতম পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালে তিনি এম্-ডি, এবং ১৯০৪ সালে শারীর-তত্ত্ব বিষয়ে

'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে তখনকার ইংরাজ সরকার কর্তৃক তিনি 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত হন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতাকে বাঙালী কেন প্রথম স্বাগত জানাইয়াছিল? ইহার ফল কি হইয়াছিল? [৩+৫]

২। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, এই বিশ্বাসের প্রেরণা আচার্য বসু কোথা হইতে পাইলেন? [২]

৩। আচার্য বসু কোন্ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং উহা দ্বারা কি ভাবে উদ্ভিদ্ যে জীবন্ত ও অনুভূতিশীল তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন? [১+৪]

৪। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের আর কোন্ ক্ষেত্রে গবেষণা করিয়াছিলেন? তাঁহার আবিষ্কারের গৌরব হইতে তিনি কি ভাবে বঞ্চিত হইয়াছিলেন? [২+৬]

৫। ইউরিয়া ষ্টিবামাইন কি? ইহা কে আবিষ্কার করিয়াছিলেন? উহা আবিষ্কারের ফলে কি হইয়াছিল? [১+১+২]

ব্যাখ্যাগত প্রশ্ন ঃ

৬। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক যে কোন দুটির বিশদ ব্যাখ্যা কর ঃ**

(ক) গত উনবিংশ শতাব্দীতে···নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

(খ) আচার্য জগদীশচন্দ্র······তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন।

(গ) অবশেষে প্রথম অভয়বাণী······ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। [৫×২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৭। **যে কোন পাঁচটি শব্দ দিয়া বাক্য গঠন কর ঃ**
রীতিনীতি, উদারভাবে, গৌরবময়, অক্ষয়কীর্তি, জড় পদার্থ, অনুভূতিশীল, আতঙ্ক। [২×৫]

৮। **যে কোন ৬টি পদের পরিচয় দাও ঃ** ইহারা, কীর্তি, আসন, চয়ন, অশ্বত্থ, যন্ত্র, জগদীশচন্দ্র, ইংরাজ, আসাম, মেধাবী, কৃতী। [১×৬]

৯। **যে কোন ৪টি শব্দের অর্থ লিখ ঃ** পাশ্চাত্য, স্নায়ুজাল, হৃৎ-স্পন্দন, অবিস্মরণীয় ঘটনা, আর্তরোল, অভয়বাণী, অব্যর্থ মহৌষধ। [১×৪]

১০ **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) ক্রেস্কোগ্রাফ কে আবিষ্কার করেন? (খ) মার্কনি কোন্ দেশের বৈজ্ঞানিক? (গ) উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মেধাবী ছাত্র ছিলেন কি করিয়া বুঝিলে? [১×৩]
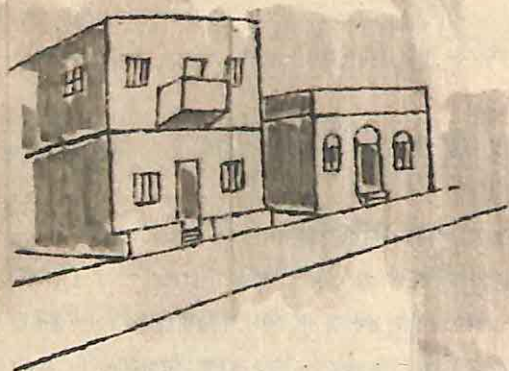
বিদ্যাসাগর

বৈশম্পায়ন ঘোষাল

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড় জিনিসকে ছোট দেখাইবার যন্ত্রস্বরূপ। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের পাশে অন্য সকলকেই ছোট দেখায়।

মাইকেল একবার ইউরোপে গিয়া ঋণগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়েন। বিদ্যাসাগর তখন তাঁহাকে বিশেষভাবে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। মাইকেল সেই ঋণ স্বীকার করিয়াছেন একটি কবিতায়:

> "বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
> করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে,
> দীন যে, দীনের বন্ধু!"

কোনো দুঃস্থ বা বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিয়া কখনও বিমুখ হইত না। যতক্ষণ তাহার দুঃখমোচন না করিতে পারিতেন ততক্ষণ তিনি শান্তি পাইতেন না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর শুধু পাণ্ডিত্য বা দয়ার জন্যই বড় ছিলেন না, তাঁহার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা মহৎ বৈশিষ্ট্য ছিল—নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতা। জীবনে কাহারও কাছে, কোনো অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করেন নাই। এই দুর্জয় পৌরুষের জন্যই কাহারও সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না। অথচ কাহারও দুঃখ দেখিলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন। তিনি ছিলেন একাধারে ফুলের মত কোমল এবং বজ্রের মত কঠোর। তাঁহার মত অনমনীয় পৌরুষ বাঙ্গালীর চরিত্রে খুব বিরল। আর সেইজন্যই অনেকে ইহা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। অন্তর তাঁহার বাঙ্গালী মায়ের মতই কোমল এবং স্নেহকাতর ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁহার পৌরুষ ও তেজস্বিতার মূল ছিল অন্যত্র। তাঁহার বংশধারার মধ্যেই উহার রহস্যটি নিহিত রহিয়াছে। তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ অসাধারণ নির্ভীক ও বলশালী পুরুষ ছিলেন। বৈষয়িক বা সাংসারিক স্বার্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাহারও তোষামোদ করিতেন না বা নিজের সুবিধার জন্য কাহারও অসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না। ইহা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। ইহার ফলে তিনি সুদীর্ঘকালের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া উধাও হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্যায়ের কাছে নত হন নাই। স্বয়ং বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতামহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এক লৌহদণ্ড তাঁহার চির সহচর ছিল। একবার তিনি অরণ্যপথে মেদিনীপুরে যাইতেছিলেন। সহসা এক বন্য ভল্লুক তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। কিন্তু ঐ লৌহদণ্ড দিয়া পিটাইয়া তিনি উহাকে মারিয়া ফেলেন। তিনি ঐ অবস্থায় বহুদূর হাঁটিয়া গিয়া এক বন্ধুর বাড়ীতে আশ্রয় লন। ইহার জন্য ছয় মাস তাঁহাকে শয্যাশায়ী থাকিতে হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর পিতামহের এই অকুতোভয়তা, অনমনীয়তা ও সত্যানুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রে পিতামাতার ধর্মানুরাগ, বিশেষতঃ মাতার পরদুঃখকাতরতা ও পিতামহের সাহস ও তেজস্বিতার সমন্বয় ঘটিয়াছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে, মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস দরিদ্র ছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যজীবন অত্যন্ত অসুবিধা ও অভাব অনটনের মধ্যে অতিবাহিত হয়। অভিভাবক হিসাবে ঠাকুরদাসের শাসন খুব কঠোর ছিল এবং ঈশ্বর ছাত্র হিসাবে খুব কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া, রাত্রে তৈলাভাবে রাস্তার ধারে গ্যাসের আলোয় পড়িয়াছেন। কখনো সারারাত্রি জাগিয়া পাঠ প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। কারণ, দিনের বেলায় সংসারের কাজে হয়তো পড়ার অবকাশ পান নাই। এই প্রতিকূল অবস্থাতেও প্রত্যেক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আর একটি মহৎ গুণ—তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তি। কথিত আছে যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কর্মকালে, তাঁহার ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ উপলক্ষে মায়ের আহ্বানে বাড়ী যাইবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের নিকট ছুটি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ছুটি না পাইয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া সাহেব ছুটি দিয়াছিলেন।

আমাদের দেশে বিধবাদের কষ্ট দেখিয়া কাতর-হৃদয় বিদ্যাসাগর মাতার আজ্ঞায় এবং পিতার সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহের প্রচলন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তুমুল আন্দোলন হয়, এবং শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি বিরোধী পণ্ডিতদের পরাজিত করেন; তাহার কথায় সরকার বিধবা বিবাহের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। এই রকমের বহু-বিবাহ বন্ধ করিবার জন্যও তিনি আন্দোলন করেন। সুতরাং

বিদ্যাসাগর একজন বড় সমাজ-সংস্কারক ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতরূপে বিদ্যাসাগর কর্মজীবন সুরু করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রসার—বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা প্রচারে বিদ্যাসাগরের চেষ্টা ও কীর্তি অতুলনীয়। সে যুগে শিক্ষার ব্যাপারে তদানীন্তন সরকার সর্বদাই বিদ্যাসাগরের পরামর্শ লইতেন। আমরা যে বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি পাই, তাহা বিদ্যাসাগরের পরামর্শে প্রচলিত হইয়াছে।

পূর্বে বাংলা গদ্যে কোনো সাহিত্য রচিত হইত না। রাজা রামমোহন রায় এবং রামরাম বসু প্রভৃতির হাতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম হয়। বিদ্যাসাগর এই গদ্যের ভাষা পরিমার্জিত করেন। তিনি সর্বপ্রথম যতিচিহ্ন ব্যবহার করিয়া বাংলা গদ্য-ভাষার প্রবাহে একটি নূতন ছন্দের সুর আনিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁহাকে বাংলা গদ্যের 'প্রথম শিল্পী' বলিয়াছেন। 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'আখ্যান মঞ্জরী', 'বোধোদয়', 'কথামালা' প্রভৃতি পুস্তকে তিনি বাংলা গদ্যের সুন্দর ও সাবলীল রূপটি আবিষ্কার করেন।

বিদ্যাসাগরের জাতীয়তাবোধ তাহার চরিত্রকে মহত্ত্বের উচ্চতম আসনে স্থাপন করিয়াছে। তিনি কখনও বিদেশী পরিচ্ছদ ধারণ করেন নাই। ধুতি ও চাদর ছিল তাহার পরিধেয়। আর ছিল চটি জুতা। এই পোষাকেই তিনি সে-যুগে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করিতেন।

বাঙ্গালীরা ভীরু ও নরম প্রকৃতির বলিয়া অপবাদ আছে। কিন্তু বিদ্যাসাগর তাহার ব্যতিক্রম। পৌরুষ ও তেজস্বিতায় অনন্যসাধারণ বিদ্যাসাগর বাংলা দেশের সমতল পলিমাটির উপর যেন প্রস্তরে গঠিত পর্বতের মত দাঁড়াইয়া আছেন—আর তাহার গাত্র বাহিয়া করুণার সহস্রধার নির্ঝর নামিয়া আসিতেছে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর কি বলিয়াছেন? [২]

২। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে পৌরুষ ও তেজস্বিতা কি পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল —না, ইহার অন্য কোন রহস্য আছে? [১+৪]

৩। রামজয় তর্কভূষণ কে ছিলেন? তাঁহার সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর কি বলিয়াছেন? [১+২]

৪। দারিদ্র্যের জন্য বিদ্যাসাগরকে কত অসুবিধা ভোগ করিয়া পড়াশুনা করিতে হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা কর। [৫]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

৫। বিদ্যাসাগর 'কুসুমের মত কোমল ও বজ্রের মত কঠোর' ছিলেন— আলোচনা কর। [৬]

৬। সমাজ-সংস্কারক এবং বিদ্যোৎসাহী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কি জান? [৫]

৭। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির একটিউদাহরণ দাও। [৪]

৮। **ব্যাখ্যা লিখ : (যে কোন একটি)**

(ক) বিদ্যার সাগর তুমি···দীনের বন্ধু। [৫]

(খ) পৌরুষ ও তেজস্বিতায়···নামিয়া আসিতেছে।

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

৯। **বিশেষ্য হইতে বিশেষণে এবং বিশেষণ হইতে বিশেষ্যে পরিবর্তিত কর (যে কোন পাঁচটি) :** দুঃস্থ, বিপন্ন, শান্তি, অকুতোভয়, প্রচলন, পরিধেয়। [১×৫]

১০। **যে কোন পাঁচটির শব্দার্থ লিখ :** সমাজ সংস্কারক, ঔপন্যাসিক, অনন্যসাধারণ, বিপন্ন, সত্যনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা, কষ্টসহিষ্ণু, যতিচিহ্ন। [১×৫]

১১। **মৌখিক প্রশ্ন :** (ক) বিধবা বিবাহ আন্দোলনে নামিবার পূর্বে তিনি কাহার সম্মতি লইয়াছিলেন? (খ) বিদ্যাসাগর কি কি পুস্তক লিখিয়াছিলেন? [১+৩]

কবি-মাতৃভাষা

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুল-লক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা – "হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী !
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে ?"

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। 'নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন'—কোন্ রতনের কথা কবি বলিতেছেন ? [১]

২। 'তা সবে আমি অবহেলা করি'—কবি কেন অবহেলা করিয়াছিলেন ? [৩]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৩। **গদ্যরূপ দাও ঃ** পরিহরি, সঁপি, ভকতি, মোর, স্বপন। [১×৫]

৪। **সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ** নিজাগার, নিরানন্দ। [১+১]

৫। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) 'নিজগৃহে ধন তব'—কিরূপ ধন ? (খ) 'কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি, এই ব্রতে'—কিসের ব্রত ? [২+২]

জন্মভূমি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এইত আমার, জগতের সার,
স্মৃতি-সুখকর জনম ঠাঁই।
সেখানে আহ্লাদে নবীন আস্বাদে,
শৈশব জীবন সুখে কাটাই॥
সে সুখের দিন আজও পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ জীবনে,
যেখানেই থাকি, যেথাই যাই ;
হেরেছি কত নগরী নগর,
কত রাজধানী অপূর্ব সুন্দর,
এ শোভা ঐশ্বর্য কোথাও নাই।
গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়,
স্মৃতি-পরিমল-মাখা সমুদয়,
হেন স্থান আর কোথায় আছে ?
জগতে জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে তুই অতুলন,
স্বরগও নিকৃষ্ট দুয়েরই কাছে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'স্মৃতি-সুখকর জনম-ঠাঁই' বলিতে কবি কি বুঝাইতেছেন ? ইহা তাঁহার কাছে 'জগতের সার' কেন ? [২+২]

২। কবির শৈশব জীবন কিরূপ কাটিয়াছিল ? নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কবির কি মনে হইয়াছে ? [২+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

৩। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক যে কোন একটির ব্যাখ্যা কর :**

(ক) হেরেছি কত নগরী নগর......কোথাও নাই।

(খ) জগতে জননী......দুয়েরই কাছে। [৫]

৪। **বাক্য রচনা কর :** আহ্লাদ, নবীন, শৈশব, ঐশ্বর্য্য, জলাশয়। [২×৫]

গ্রাম্য ছবি

গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী

মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়াগুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান,
খড়ো চালখানি ছাঁটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে করেছে উত্থান।
পিঁজারায় বস্ত্র বাঁধা 'বউকথা' কহে কথা,
বিড়ালটি শুইয়া দাবাতে ;
মঞ্চে তুলসীর চারা গৃহে শিল্প কড়ি-ঝারা,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে।
কানে দুল দুলদুল্ গাছভরা পাকা কুল
ধীরে ধীরে পাড়ে দুটি বোনে ;
ছোটো হাতে জোর ক'রে শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাঁটা ফুটে হাত লয় টেনে।
পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস দুটি করে সন্তরণ,
পুকুরের পাড়ে বাঁশবন।
শূন্য জনকোলাহল, কিচিমিচি পাখিদল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
রোদটুকু সোনার বরণ।

লুটায় চুলের গোছা, বালাছুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে।
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে
তরুতলে রাখাল শয়ান,
সরু মেঠো রাস্তা বেয়ে পথিক চলেছে গেয়ে
সাথে মিশে ঘুঘুর সে তান।
আজি এই দ্বিপ্রহরে, বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে
মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান।
সুধাময়ি জন্মভূমি, তেমনি আছ কি তুমি
শান্তিমাখা, স্নিগ্ধ শ্যাম প্রাণ?

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন:

১। কবি 'শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে' একটি পল্লীগৃহ ও তাহার চারিপার্শ্বের যে ভাষাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। [৮]

২। এই কবিতাটির মধ্যে যতগুলি পাখী ও জীবজন্তুর নাম আছে তাহা লিখ। [৩]

ব্যাখ্যাগত প্রশ্ন:

৩। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক যে কোন একটির ব্যাখ্যা লিখ—**

(খ) শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে······ঘুঘুর সে তান।

(খ) আজি এই দ্বিপ্রহরে······স্নিগ্ধ শ্যাম প্রাণ? [৫]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন:

৪। **বাক্যে ব্যবহার কর:** খড়ো, মঞ্চ, মেঠো, গ্রাম্য, জনকোলাহল। [১×৫]

৫। **যে কোন তিনটির অর্থ লিখ:** মঞ্চ, কলমীর দল, সন্তরণ, স্বনন, তান। [১×৩]

৬। **মৌখিক প্রশ্ন:** গ্রাম্য ছবি দেখিয়া কবির কি মনে পড়িতেছে? ভাষায় চিত্রিত কর। [৪]

বাংলার মাটি বাংলার জল

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক্, পুণ্য হউক্,
পুণ্য হউক্ হে ভগবান ॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ—
পূর্ণ হউক্, পূর্ণ হউক্,
পূর্ণ হউক্, হে ভগবান ॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক্, সত্য হউক্,
সত্য হউক্ হে ভগবান ॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক্, এক হউক্,
এক হউক্, হে ভগবান ॥

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। এই কবিতাটিতে কবি বাঙালীদের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং বাংলার অখণ্ডতা কামনায় কি কি প্রার্থনা করিয়াছিলেন ? [৫]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

২। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ ঃ** বাঙালির প্রাণ, বাঙালীর মন··· হে ভগবান ॥ [৫]

৩। পুণ্য, পূর্ণ, পণ, আশা, ভাষা—**এই শব্দগুলির পাঁচবার করিয়া লিখ এবং এইগুলির দ্বারা একটি করিয়া বাক্য রচনা কর।** [৩×৫]

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) বাংলার মাটি, জল, বায়ু, এবং ফল বলিতে কি বুঝাইতেছে ? (খ) বাঙালির ঘরে যত ভাইবোনদের এক হইতে হইবে কেন ? (গ) বাঙালির পণ ও বাঙালির আশা কি ? [২×৩]

ছোটোবড়ো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখনো তো বড়ো হইনি আমি,
ছোটো আছি ছেলেমানুষ বলে।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হব
বড়ো হয়ে বাবার মত হলে।
দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখির ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তারে এমনি বকে দেব!
বলব, 'তুমি চুপটি ক'রে পড়ো'।
বলব, 'তুমি দুষ্টু ছেলে'—
যখন হব বাবার মতো বড়ো।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষব পাখির ছানা।

সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
নাবার জন্যে করব না তো তাড়া।
ছাতা একটা ঘাড়ে করে নিয়ে
চটি পায়ে বেড়িয়ে আসব পাড়া।
গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বলব ঘরে,
তিনি যদি বলেন, 'সেলেট কোথা?
দেরি হচ্ছে, বসে পড়া করো'
আমি বলব, 'খোকা তো আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
'গুরুমশায় শুনে তখন কবে,
'বাবুমশায়, আসি এখন তবে।'
খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা
আমি তাকে ধমক দিয়ে কব,
'কাজ করছি, গোল কোরো না মেলা'।
রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়
একলা যাব, করব না তো ভয়—
মামা যদি বলেন ছুটে এসে,
'হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো'
বলব আমি, 'দেখছ না কি মামা,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।'
দেখে দেখে মামা বলবে, 'তাই তো,
খোকা আমার সে খোকা আর নাই তো।'

আমি যেদিন প্রথম বড়ো হব
মা সেদিনে গঙ্গাস্নানের পরে

আসবে যখন খিড়কি দুয়োর দিয়ে
ভাব্‌বে 'কেন গোল শুনি নে ঘরে।'
তখন আমি চাবি খুলতে শিখে,
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝিকে,
মা দেখে তাই বলবে তাড়াতাড়ি,
'খোকা, তোমার খেলা কেমনতরো'।
আমি বলব, 'মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি যে বাবার মতো বড়ো।
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা, এনে দেব আবার।'
আশ্বিনেতে পূজোর ছুটি হবে,
মেলা বসবে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকো কত দূরের থেকে
লাগবে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।
বাবা মনে ভাববে সোজাসুজি,
খোকা তেমনি খোকাই আছে বুঝি,
ছোটো ছোটো রঙিন জামা জুতো
কিনে এনে বলবে আমায় 'পরো'।
আমি বলব, 'দাদা পরুক এসে,
আমি এখন তোমার মতো বড়ো।
দেখছ না কি যে ছোটো মাপ জামার—
পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার।'

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। শিশু হঠাৎ একদিন বড় হইয়া দাদা, গুরুমহাশয় এবং ভৃত্য ভুলুর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? [২×৩]

২। কে শিশুকে কখন এই কথাগুলি বলিয়াছিল এবং শিশু কি উত্তর দিয়াছিল?

(ক) 'হারিয়ে যাবে, আমার কোলে চড়ো'। [১+১+১]

(খ) 'খোকা তোমার খেলা কেমনতরো'। [১+১+১]

৩। শিশু তাহার পিতাকে কোন্ প্রসঙ্গে বলিয়াছিল—
'আমি এখন তোমার মতো বড়ো'। এই বক্তব্যের মধ্যে শিশুর কি মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ? [২+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

৪। **ব্যাখ্যা লিখ ঃ** আমি এখন তোমার মতো······আঁট হবে যে আমার। [৫]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৫। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ** —ছুটি। —ছানা। —দুষ্টু ছেলে। চুপটি —পড়ো। গোল কোরো না—। [১×৫]

৬। **লিঙ্গান্তর কর ঃ** দাদা, খোকা, মামা, মা, ঝি। [১×৫]

৭। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) খোকা ছাতা হাতে চটি পায়ে পাড়া বেড়াইয়া আসিতে চায় কেন ? (খ) 'বাবুমশায়, এখন আসি তবে'—এই কথা কে, কাহাকে এবং কেন বলিলেন ? [১+৩]

কণিকা

প্রিয়ম্বদা দেবী

ছোট বালুকার কণা, বিন্দু বিন্দু জল
গড়ি' তোলে মহাদেশ, সাগর অতল।
মুহূর্ত নিমেষ কাল তুচ্ছ পরিণাম
গড়ে যুগ যুগান্তর—অনন্ত মহান্।
প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি ক্ষুদ্র অপরাধ,
ক্রমে টানে পাপ-পথে ঘটায় প্রমাদ
প্রতি করুণার দান, স্নেহপূর্ণ বাণী
এ ধরায় স্বর্গসুখ নিত্য দেয় আনি।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কবিতাটির সারমর্ম কি ? [৫]

২। **অর্থ সহ পাঁচটি বাক্য গঠন কর ঃ** অতল, মুহূর্ত, নিমেষ, পরিণাম, বাণী, স্বর্গসুখ। [২×৫]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

৩। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ ঃ** 'প্রত্যেক সামান্য ত্রুটি……ঘটায় প্রমাদ।' [৫]

৪। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) ছোট বালুকার কণা একত্রে মিলিয়া কি গঠন করে ? (খ) বিন্দু বিন্দু জল মিলিয়া কি গড়িয়া তুলে ? (গ) প্রত্যেকটি স্নেহপূর্ণ বাণী আমাদের কি দিতে পারে ? [১×৩]

আ মরি বাংলা ভাষা

অতুলপ্রসাদ সেন

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা !
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা !
কি যাদু বাংলা গানে ! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে !
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ।
এই ভাষাতে নিতাই গোরা আন্‌ল দেশে ভক্তিধারা,
আছে কৈ এমন ভাষা এমন দুঃখ-শ্রান্তিনাশা ।
বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন,
এই ফুলেরই মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা !
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌ল মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা ।
এই ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাক্‌নু মায়ে 'মা' 'মা' বলে
এই ভাষাতেই বলব 'হরি' সাঙ্গ হলো কাঁদা-হাসা !

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। বাংলা ভাষা আমাদের গর্ব ও আশা কেন ? [৩]

২। "এই ফুলের মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা"—এখানে কোন্ ফুলের কথা বলা হইয়াছে ? কোন্ কোন্ কবি বাসা বেঁধেছেন ? [২+১]

৩। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর ঃ** বাজিয়ে রবি……করে যাওয়া আসা। [৫]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৪। **বাক্য রচনা কর ঃ** আ মরি, যাদু, বোল, মধুর, সাঙ্গ। [২×৫]

বাংলাদেশ

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

কোন্ দেশেতে তরুলতা
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চলতে গেলেই
দলতে হয় রে দূর্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল ফোটেরে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

কোথায় ডাকে দোয়েল-শ্যামা
ফিঙে গাছে গাছে নাচে ?
কোথায় জলে মরাল চলে,
মরালী তার পাছে পাছে ;
বাবুই কোথা বাসা বোনে,
চাতক বারি যাচে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

কোন্ ভাষা মরমে পশি'—
আকুল ক'রে তোলে প্রাণ ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব
বাউল সুরের মধুর গান ?
চণ্ডীদাসের রামপ্রসাদের
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !
কোন্ দেশের দুর্দশায় মোরা
সবার অধিক পাইরে দুখ ?
কোন্ দেশের গৌরবের কথায়
বেড়ে ওঠে মোদের বুক !
মোদের পিতৃ-পিতামহের
চরণ-ধূলি কোথায় রে ?
সে আমাদের বাংলা দেশ,
আমাদেরই বাংলা রে !

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। বাংলা দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা কর। [৫]

২। বাংলা দেশের দুর্দশায় কবি কাতর হন এবং গৌরবে গৌরব বোধ করেন কেন ? [২+২]

৩। চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ সম্পর্কে কি জান সংক্ষেপে লিখ। [৪+৪]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

৪। **অর্থ লিখ :** শ্যামল, কমল, কোমল, মরাল, দুর্দশা। [১×৫]

৫। **মৌখিক প্রশ্ন :** (ক) বাবুই কোথায় বাসা বোনে ? (খ) চাতক কাহার কাছে বারি প্রার্থনা করে ? [১+১]

তরুণ দল

গুরুসদয় দত্ত

বাংলা-মা'র দুর্নিবার আমরা তরুণদল।
শ্রান্তিহীন ক্লান্তিহীন সঙ্কটে অটল ॥

গঙ্গা-রাঢ়, পাল রাজার বীর্য্য গরিমা—
চণ্ডীদাস জয়দেবের ছন্দ মহিমা—
ঢেউ তাদের দেয় মোদের চিত্তে নব বল ॥

নিঃস্বতার দৈন্যভার কর্‌ব উৎপাদন ;
অজ্ঞতার অন্ধকার কর্‌ব নির্বাসন ;
এই যুগের উন্মেষের জ্বাল্‌ব দীপ উজল ।।

সংযমের পৌরুষের পাল্‌ব প্রেরণা,
শ্রমযোগের উদ্‌যোগের সাধ্‌ব সাধনা ;
বাংলা-মার' লাঞ্ছনার মুছ্‌ব আঁখিজল,
আমরা তরুণ দল ।।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। তরুণ দলের সঙ্কল্পগুলি বিবৃত কর। [৫]

২। বাংলা তরুণ দল কোথা হইতে প্রেরণা পাইতেছে ? [৩]

৩। **যে কোন তিনটির সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ** গঙ্গা-রাঢ়, পাল রাজা, চণ্ডীদাস, জয়দেব। [৩×৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

৪। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ ঃ** শ্রমযোগের উদযোগের........ আমার তরুণ দল। [৫]

৫। **যে কোন পাঁচটি শব্দের অর্থ লিখ ঃ** দুর্নিবার, সঙ্কট, চিত্ত, উৎপাদন, অজ্ঞতা, লাঞ্ছনা, দৈন্যভার। [১×৫]

৬। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** কবিতাটিতে উল্লিখিত সঙ্কল্পগুলির মূল লক্ষ্য কি ? [৩]

গোঁফচুরি

সুকুমার রায়

হেড্ অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানতো ?
দিব্যি ছিলেন খোসমেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা বসে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন খেপে !
আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি ক'রে গোল,
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল !"
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউ বা হাঁকে পুলিশ,
কেউ বা বলে "কামড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস।"
ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি,
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি !"
গোঁফ হারানো ! আজব কথা ! তাও কি হয় সত্যি ?
গোঁফ জোড়া তো তেমনি আছে, কমেনি এক রত্তি।
সবাই তাঁকে বুঝিয়ে বলে, সামনে ধরে আয়না,
মোটেও গোঁফ হয়নি চুরি, কক্ষনো তা হয়না।
রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,

"এমন গোঁফ তো রাখত জানি শ্যামবাবুদের গয়লা।
"এ গোঁফ যদি আমার বলিস করব তোদের জবাই"—
এই না বলে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায়।
ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশি লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
"অফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর,
"গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
"ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধরে খুব নাচি,
"মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধরে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
"গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা
"গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কে কোন্ অবস্থায় বলিয়াছিলেন—'গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল!' [৩]

২। হেড অফিসের বড়বাবু তাঁহার গোঁফ চুরি হইয়াছে মনে করিয়া কি কাণ্ড করিয়াছিলেন তাহা নিজের ভাষায় বল। [৫]

ব্যাকরণমূলক প্রশ্ন ঃ

৩। **যে কোন পাঁচটি শব্দের অর্থ লিখ ঃ** ব্যামো, খেপে, বস্তি, একরত্তি, বিচ্ছিরি, লাই, মুখ্যু। [১×৫]

৪। **শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ** বেশি——দিতে নেই; কথার——ধারিনে ——দিয়ে চাঁচি। [১×৩]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

৫। **যে কোন দুটির ব্যাখ্যা কর ঃ** (ক) নোংরা ছাঁটা······শ্যামবাবুদের গয়লা। (খ) গোঁফকে বলে——দিয়ে যায় চেনা। [৫×২]

৬। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) 'অফিসের এই বাঁদরগুলো' বলিতে কাহাদের বুঝানো হইতেছে? (খ) শ্যামবাবুদের গয়লা কি রকম গোঁফ রাখিত? [১+২]

কিশোর

মৌলভী গোলাম মোস্তাফা
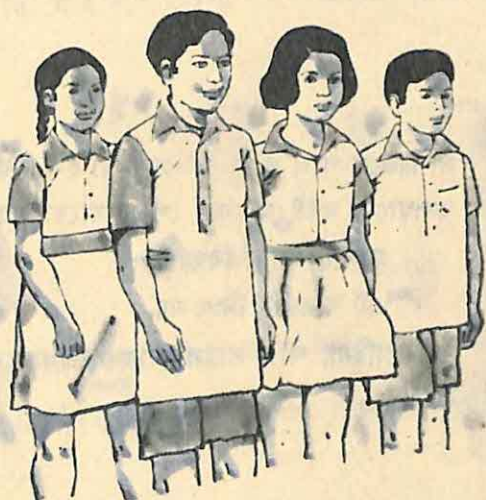
আমরা নূতন আমরা কুঁড়ি নিখিল বন-নন্দনে,
ওষ্ঠে রাঙ্গা হাসির রেখা, জীবন জাগে স্পন্দনে।
লক্ষ আশা অন্তরে
ঘুমিয়ে আছে মন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে বুকের ভাষা পাপড়ি পাতার বন্ধনে॥

সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুটবো মোরা ফুটবো গো!
প্রভাত রবির সোনার আলো দুহাত দিয়ে লুটবো গো!
নিত্য নবীন গৌরবে
ছড়িয়ে দিব সৌরভে,
আকাশ পানে তুলবো মাথা সকল বাঁধন টুটবো গো!

কেউ বা যাবো দেশ বিজয়ে, সাজ্‌বো রাজা 'সিকন্দর',
সঙ্গে নিয়ে লক্ষ সেনা ছুট্‌বো গো দিক্‌-দিগন্তর ;
হাতি-ঘোড়ার চট্‌পটে,
কামান-গোলার পট্‌পটে
দেশবিদেশের সকল রাজা কাঁপবে ভয়ে নিরন্তর।

সাগরজলে পাল তুলে দে' কেউ বা হব নিরুদ্দেশ,
কলম্বাসের মতই বা কেউ পৌঁছে যাবো নূতন দেশ।
জাগ্‌বে সাড়া বিশ্বময়—
এই বাঙালী নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান-গরিমা, শক্তি সাহস আজও এদের হয়নি শেষ।

কেউবা হবো সেনানায়ক, গড়্‌বো নূতন সৈন্যদল,
সত্য ন্যায়ের অস্ত্র নেবো, নাইবা থাকুক অন্য বল।
দেশমাতারে পূজবো গো,
ব্যথীর ব্যথা বুঝবো গো,
ধন্য হবে দেশের মাটি ধন্য হবে অন্নজল।

জ্ঞানার্জনের আশায় মোরা উঠবো গিয়ে জার্মানী,
সবার আগে চল্‌বো মোরা আর কি কভু হার মানি ?
শিল্পকলা শিখ্‌বো কেউ,
গ্রন্থমালা লিখ্‌বো কেউ,
কেউ বা হবো ব্যবসাজীবী, কেউ বা 'টাটা', 'কার্নানি'।

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে।
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।
আকাশ আলোর আমরা সুত
নূতন বাণীর অগ্রদূত,
কতই কি যে ক'রবো মোরা, নাইক তাহার অন্ত রে!

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কিশোর-মনের আকাঙ্খাগুলি নিজের ভাষায় লিখ। [৫]

২। ইঁহাদের বিষয় যাহা জান লিখ : সিকন্দার, কলম্বাস, টাটা, কার্নানি— [৩×৪]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :

৩। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা লিখ :** "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে।" [৫]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন :

৪। **যে কোন পাঁচটি শব্দের দ্বারা বাক্য রচনা কর ও অর্থ লিখ :** নিখিল, বাণী, অগ্রদূত, নিরন্তর, সেনানায়ক, সুত, অন্ত। [৩×৫]

৫। **যে কোন দুটির গদ্যরূপ লিখ :** (ক) আমরা নূতন আমরা কুঁড়ি নিখিল বন-নন্দনে ; (খ) সবার আগে চলব মোরা আর কি কভু হার মানি ? (গ) ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে। [২×২]

৬। **মৌখিক প্রশ্ন :** (ক) জ্ঞানার্জনের জন্য জার্মানীতে যাইতে হইবে কেন ? (খ) 'নূতন বাণীর অগ্রদূত' কথাটির অর্থ কি ? [২+২]

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হ'তে ভাই রে,
কর্মী হবার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে।
পাহাড় শিখায় তাহার সমান হই যেন ভাই মৌন মহান্
খোলা মাঠের উপদেশে প্রাণ-খোলা হই ভাই রে॥

তপন আমায় মন্ত্রণা দেয় আপন তেজে জ্বলতে,
চাঁদ শিখালো হাসতে মিঠে মধুর কথা বলতে।
ইঙ্গিতে তার শিখায় সাগর অন্তর হোক রত্ন-আকর
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম আপন বেগে চলতে॥

মাটির কাছে সহিষ্ণুতার পেলাম আমি শিক্ষা,
আপন কাজে কঠোর হ'তে পাষাণ দিল দীক্ষা।
ঝরণা তাহার সহজ তানে গান জাগালো আমার প্রাণে,
শ্যাম বনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা॥

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র,
নানা ভাবের নতুন জিনিস শিখছি দিবারাত্র।
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়,
শিখছি সে সব, লজ্জা দ্বিধা নেইকো কণামাত্র॥

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কবি কাহার কাছে কি কি শিখিয়াছেন তাহা লিখ। [৫]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

২। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর ঃ**
(ক) "বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা……শিখছি দিবারাত্র।"
(খ) এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়……নেইকো কণামাত্র। [৫×২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন ঃ

৩। **দুইটি করিয়া প্রতিশব্দ লিখ ঃ**
আকাশ, তপন, চাঁদ, সাগর, নদী, পাষাণ। [২×৬]

৪। **৬টি শব্দ দিয়া বাক্য গঠন কর ঃ** মৌন, প্রাণখোলা, মন্ত্রণা দেয়, ইঙ্গিতে, রত্নআকর, সহিষ্ণুতা, বনানী। [২×৬]

৫। **যে কোন একটির গদ্যরূপ লিখ ঃ**
(ক) ঝরণা তাহার সহজ তানে গান জাগালো আমার প্রাণে
শ্যাম বনানী সরসতা আমায় দিল ভিক্ষা॥
(খ) বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র। [২]

৬। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) উদার হইতে শিক্ষা দিল কে? (খ) মাটির কাছে কি শিক্ষা পাইলাম? (গ) পাহাড়ের শিক্ষা কি? [১×৩]

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য

রানার ছুটেছে তাই ঝুম্ ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে,
রানার চলেছে, রানার।
রাত্রির পথে পথে চলে কোনো নিষেধ জানেনা মানার।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার—
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার।
রানার ! রানার !
জানা অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ;
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয়।
তার জীবনের স্বপ্নের মতো পিছে স'রে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ—বুঝি হয় লাল ও-পূর্ব কোণ।

অবাক রাতের তারারা আকাশে মিট্‌মিট্‌ করে চায় ঃ
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে হরিণের মত যায় !
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে ;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্ ঠন্ জোনাকিরা দেয় আলো
মাভৈঃ, রানার ! এখনো রাতের কালো।

(সংক্ষেপিত)

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

যে কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। (ক) রানারের জীবনের স্বপ্ন কি ?
(খ) রানারকে কি কাজ করিতে হয় ?
(গ) 'রানার ছুটেছে তাই ঝুম্‌ঝুম্ ঘণ্টা বাজছে রাতে'—কেন ঘণ্টা বাজিতেছে ? [২+২]

তথ্যমূলক প্রশ্ন ঃ

২। (ক) 'কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার'—কি' সে নতুন খবর ?
(খ) 'মাভৈঃ, রানার ! এখনো রাতের কালো।'—কবি এই কথা কেন বলিয়াছেন ? [৩+৩]

৩। 'শহরে রানার যাবেই পৌছে ভোরে'—রানার কোথা হইতে আসিতেছে ? [২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ঃ

৪। **প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক যে কোন একটির ব্যাখ্যা লিখ ঃ**
(ক) জানা অজানার ·····চিঠি আর সংবাদে।
(খ) তার জীবনের স্বপ্নের······স'রে যায় বন। [৫]

৫। **অর্থ লিখ ঃ** দিগন্ত, দুর্বার, দুর্জয়, মাভৈঃ, জোনাকি। [১×৫]

৬। **বাক্য গঠন কর ঃ** দিগন্তে, ভোর হয় হয়, মিট্‌ মিট্‌ ক'রে, সবেগে, নিষেধ। [২×৫]

৭। **মৌখিক প্রশ্ন ঃ** (ক) রানারের পোষাক কেমন ? (খ) রানারের হাতে কি কি থাকে ? [২+২]

লেখক কথা : [প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম ১৮২০, মৃত্যু ১৮৯১। মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম। 'বিদ্যাসাগর' তাঁহার উপাধি হইলেও তিনি ছিলেন যথার্থই বিদ্যার সাগর এবং দয়ার সাগর। তাঁহার হাতেই আধুনিক বাংলা গদ্য গড়িয়া উঠে। বিদ্যাসাগরের লেখনীই বাংলার শিশু-শিক্ষার জননী।

লেখন কথা : আলোচ্য কাহিনীটি তাঁহার বিখ্যাত 'কথামালা' হইতে গৃহীত হইয়াছে। আত্মনির্ভর না হওয়া পর্যন্ত কোন কার্য সমাধা হয় না পরের উপর নির্ভর না করিয়া নিজে উদ্যোগী হইলেই কার্য হয়। ইহাই গল্পটির অন্তর্নিহিত শিক্ষা এবং মূল বক্তব্য।]

লেখক কথা : [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৩৮, মৃত্যু ১৮৯৪। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পথিকৃৎ, শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচয়িতা এবং প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ লেখক।

লেখন কথা : এখানে লেখক বলিয়াছেন, ঐক্যই বল। যে একা সেই ক্ষুদ্র। একটি বৃষ্টিবিন্দুর পৃথক কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হইলে বৃষ্টিধারা পৃথিবী ভাসাইতে পারে, পৃথিবীকে বাঁচাইতে পারে।]

লেখক কথা : [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে ১৮৬১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু ১৯৪১। ইনি আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি ১৯১৩ খৃঃ এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম বিখ্যাত নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং বিশ্ব কবি নামে খ্যাতিলাভ করেন।

লেখন কথা : এখানে কবির কবি-জীবন আরম্ভের কাহিনী স্বয়ং কবিই বলিতেছেন। রচনাটি কবির বাল্যজীবনের স্মৃতিচারণ।]

লেখক কথা : [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সন্তান। জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯৫১। ইনি বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী এবং ভাষার যাদুকর, ভাষা শিল্পী। প্রবন্ধটি রাণী চন্দ কর্তৃক অনুলিখিত।

লেখন কথা : এখানে পুরানো কালের স্বদেশী আন্দোলনের জন্মকথা সহজ করিয়া বলা হইয়াছে। এই আন্দোলনে শুধু দেশের ধনীরাই আসেন নাই, নরনারী নির্বিশেষে সমাজের সাধারণ মানুষও তাঁহাদের শেষ সম্বল লইয়া আগাইয়া আসিয়াছিলেন।

জানিবার কথা : রবিকাকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বলু—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পশুপতিবাবু—পশুপতি বসু, ইঁহার বাগবাজারের বাড়ীর সামনের মাঠে বহু সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইত। দিনু—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। হ্যাভেল সাহেব—কলিকাতা আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, ই, বি, হ্যাভেল। ইনি ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা। রাজেন মল্লিক—চোরাবাগানের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক, বাড়ীর নাম মার্বেল প্যালেস। সুরেন—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দীপুদা—দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা।]

লেখক কথা : [অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মলাভ করেন। মৃত্যু ১৯৩৮। বঙ্কিমোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ইঁহার ছোট গল্পের সংখ্যা কম। 'মহেশ' সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছোট গল্প। সমাজের কঠোর ব্যবস্থার জন্য যাহারা নিপীড়িত, তাহাদের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিই ইঁহার গল্প উপন্যাসের মূল সুর। লেখকের সেই সহানুভূতি হইতে 'মহেশ' গল্পের ষাঁড় এবং এই গল্পের পাঁঠাও বঞ্চিত নহে।

লেখন কথা : শাস্ত্র বা আচারের দোহাই দিয়া পাঁঠা বলি দিলেও এইসব অসহায় প্রাণীদের অকারণে হত্যা করা অন্যায়। সমস্ত প্রাণীই জগজ্জননীর সন্তান, সকলেরই বাঁচার অধিকার আছে—এই কথাটাই হচ্ছে এই গল্পের মূল কথা।]

লেখক কথা : [ভ্রমণ প্রিয় কথা-সাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল—জন্ম ১৯০৭, মৃত্যু ১৯৮৩। ভ্রমণ-সাহিত্য রচনার নূতন ধারার প্রবর্তক। 'মহাপ্রস্থানের পথে' তাঁহার একটি প্রখ্যাত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

লেখন কথা : হিমালয়ের দুর্গম শৈবতীর্থ কেদারনাথ। লেখক এখানে সেই দুর্গম তীর্থের দুর্লভ বর্ণনা দিয়াছেন।]

লেখক কথা : [সুধাংশুশেখর গুপ্তের জন্ম ১৯০৮, মৃত্যু ১৯৭৭। ইনি একজন কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্।

লেখন কথা : চাঁদের মাটিতে মানুষের পদার্পণ শুধু এই শতাব্দীর নয়, সর্বকালের বিস্ময়কর ঘটনা। এই গ্রহের মানুষ কি করিয়া বিজ্ঞান-সাধনার বলে গ্রহান্তরে যাত্রা করিয়াছে তাহারই কৌতূহলী বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।]

লেখক কথা : [সুবোধ সেনগুপ্তের জন্ম ১৯০৮, মৃত্যু ১৯৮১। ইনি একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক ও সাহিত্যব্রতী।

লেখন কথা : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আমাদের জাতীয় পতাকার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস জড়িত। তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইখানে দেওয়া হইয়াছে।]

লেখক কথা : [বীরেন্দ্রকুমার চৌধুরীর জন্ম ১৯২৭। অধ্যাপক এবং লেখক।

লেখন কথা : ধর্মনেতা হইয়াও বিবেকানন্দ দেশ-প্রেমিক এবং মানবদরদী। স্বদেশপ্রীতি এবং মানবসেবা তাঁহার ধর্মচিন্তার মূল কথা। মানবসেবার জন্যই রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম। তিনি দেশবাসীর মধ্য দিয়া দেশকে চিনিয়াছেন এবং দেশের কথা চিন্তা করিয়া দেশবাসীকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন।]

লেখক কথা : [অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৩০। ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক।

লেখন কথা : আচার্য স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু এবং ডঃ স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী উভয়েই বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক। আচার্য বসু উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং ডঃ ব্রহ্মচারী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহাদের আবিষ্কারের জন্য স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন।]

লেখক কথা : [বৈশম্পায়ন ঘোষালের জন্ম ১৯৪৪। ইনি একজন শিক্ষাব্রতী, কবি ও সাহিত্যিক।

লেখন কথা : বিদ্যাসাগর বাংলার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক এবং বিদ্যোৎসাহী মনীষী : অসাধারণ তেজস্বী পুরুষ, অসামান্য দাতা ও মাতৃভক্ত।]

কবি কথা : [মাইকেল মধুসূদন দত্ত —জন্ম ১৮২৪, মৃত্যু ১৮৭৩। বাংলা চতুর্দশপদী কবিতা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক।

কবির কথা : কবি প্রথমে বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করিলেও পরে মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়া খ্যাত হন।]

কবি কথা ঃ [কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৩৮, মৃত্যু ১৯০৩। 'বৃত্র-সংহার' তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য।

কবির কথা ঃ 'জন্মভূমি' একটি দেশপ্রেমের কবিতা। জন্মভূমি বা মাতৃভূমি প্রত্যেক মানুষের কাছে মায়েরই মত পরম প্রিয়, গর্ব ও গৌরবের। জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও গরীয়সী।]

কবি কথা ঃ [গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী—জন্ম ১৮৫৮; মৃত্যু ১৯২৪। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতমা প্রসিদ্ধ মহিলা কবি। ইনি গার্হস্থ্য-জীবন অবলম্বন করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। ইঁহার প্রধান গুণ আন্তরিকতা ও সরলতা।

কবির কথা ঃ 'গ্রাম্য ছবি' কবিতাটিতে অতি সুন্দর ও সহজ ভাষায় একটি পল্লীগৃহ ও তাহার পরিবেশের ছবি কবি আঁকিয়াছেন। গ্রামের এই শান্ত সুন্দর সজীব ছবি আঁকিবার সঙ্গে সঙ্গে কবির নিজের শৈশবকাল ও নিজের জন্মভূমির স্মৃতিও মনে পড়িতেছে।]

কবির কথা ঃ [লর্ড কার্জনের আমলে বঙ্গ-বিভাগ আইনের প্রতিবাদে উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন উৎসবের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ঐ রাখীবন্ধন উৎসবের দিন বাংলাদেশের অখণ্ডতা রক্ষার মহামন্ত্ররূপে 'বাংলার মাটী বাংলার জল' এই সঙ্গীতটি বঙ্গদেশে সহস্র কণ্ঠে গীত হইয়াছিল।]

কবির কথা ঃ ["ছোটো বড়ো" কবিতাটিতে শিশুমনের কল্পনা-বিলাসের অপূর্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শিশু বাবার মত বড় হইয়া কি করিবে তাহারই বিবরণ দেওয়া হইয়াছে এই কবিতাটিতে। ছোটোর মনে বড়ো হওয়ার স্বপ্নটি সুন্দরভাবে প্রকাশিত।]

কবি কথা ঃ [প্রিয়ম্বদা দেবী—জন্ম ১৮৭৯, মৃত্যু ১৯৩৫। ইনি সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রপ্রভাবের আওতায় থাকিয়া কাব্য রচনা করেন।

কবির কথা ঃ সামান্য ছোট জিনিসও অবহেলার বস্তু নয়, তাহাদের সমষ্টি বা সমন্বয় পরম মঙ্গল বা চরম অমঙ্গলের কারণ হইতে পারে।]

কবি কথা ঃ [অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯৩৪। অতুলপ্রসাদের কবিতা-গুলি গান হিসাবেই খ্যাতি ও স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে।

কবির কথা ঃ বাংলা ভাষাপ্রীতি ও দেশপ্রেম তাঁহার কবিতার প্রধান সুর। আলোচ্য কবিতাটিতে মাতৃভাষার জন্য যে গর্ব-বোধ তাহা দেশপ্রেমেরই লক্ষণ।]

কবি কথা ঃ [ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম ১৮৮২, মৃত্যু ১৯২২। এই কবিকে রবীন্দ্রনাথ 'ছন্দের রাজা' আখ্যা দিয়া-ছিলেন।

কবির কথা ঃ [আলোচ্য কবিতাটিতে জন্মভূমি বাংলাদেশ কেন কবির এত প্রিয় সেই কথাই বাংলার নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন ঐতিহ্যভিত্তিক প্রসঙ্গ পর্যালোচনাক্রমে ব্যক্ত করিয়াছেন।]

কবি কথা ঃ [সমাজসেবী আই, সি, এস, গুরুসদয় দত্তের জন্ম ১৮৮২, মৃত্যু ১৯৪১। ১৯৩১ সালে ইনি ব্রতচারী নৃত্য-আন্দোলনের প্রবর্তন করেন।

কবির কথা ঃ এই কবিতায় কবি বাংলার তরুণদের মহৎ সঙ্কল্পের কথা বলিয়াছেন। মহৎ সংকল্প গ্রহণ ও পালনের মধ্য দিয়াই নিজের ও দেশের মুখ উজ্জ্বল করা যায়।]

কবি কথা : [সুকুমার রায়—জন্ম ১৮৮৭, মৃত্যু ১৯২৩। বিখ্যাত শিল্পী ও শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র এবং বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের পিতা। কবির বিখ্যাত গ্রন্থ 'আবোল-তাবোল।'

কবির কথা : এইটি হাস্যরসের একটি কৌতুক কবিতা। অবাস্তব কথা আর কল্পনায় হেঁয়ালি সৃষ্টি করিয়াই কবি কবিতাটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন।]

কবি কথা : [মৌলভী গোলাম মোস্তাফার জন্ম ১৮৯৭, মৃত্যু ১৯৬৪। কবি ও শিক্ষকরূপে তিনি খ্যাতিলাভ করেন।

কবির কথা : এই কবিতায় কবি কিশোর মনের বিচিত্র স্ফুটনোন্মুখ আকাঙ্ক্ষাগুলিকে কবিতার ভাষায় সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।]

কবি কথা : [সুনির্মল বসু—জন্ম ১৯০২, মৃত্যু ১৯৬০। ছন্দে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো এবং কৌতুকরসে সুকুমার রায়ের মতো ইনি নিপুণ ছিলেন। শিশুসাহিত্যে সুনির্মল বসুর অবদান বিশিষ্ট।

কবির কথা : প্রকৃতির মতো শিক্ষাদাত্রী আর নাই। প্রকৃতির পাঠশালাই শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র। এই কবিতায় সেই কথাই বলা হইয়াছে।]

কবি কথা : [সুকান্ত ভট্টাচার্য—জন্ম ১৯২৬, মৃত্যু ১৯৪৭। কিশোর-কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বাংলা সাহিত্যে এক আশ্চর্য প্রতিভা : মাত্র একুশ বৎসরের জীবন। সুকান্ত বঞ্চিত জীবনের কবি বলিয়া খ্যাত।

কবির কথা : সাধারণ কর্মীর ক্লিষ্ট জীবন ও গভীর দায়িত্ববোধের কথা এখানে বলা হইয়াছে। ইহাদের সুকঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়াই আধুনিক জগতে স্বস্তি ও সভ্যতার আলো নামিয়া আসে, ভোর হয়। 'রানার' একটি বিখ্যাত কবিতা।]

নূতন শব্দার্থ যা শিখলে

সারসী ও তাহার শিশু সন্তান

নিমিত্ত—জন্য, হেতু, কারণ
অন্বেষণে—খোঁজে, অনুসন্ধানে
আসিবেক—আসিবের প্রাচীন প্রয়োগ
ভরসায়—নির্ভরতায়, আশায়
প্রত্যুষে—উষাকালে, ভোরবেলায়
স্বয়ং—নিজে, আপনি

বৃষ্টি

পথিকৃৎ—পথ-প্রদর্শক, যিনি পথ দেখান
ঐক্য—একতা
মহাকল্লোলে—ভীষণ কল কল শব্দে
ভীমবাদ্যে—প্রচণ্ড শব্দে। কন্দর—গুহা।
গোলাম—ভৃত্য, আজ্ঞাবাহী
পাপিষ্ঠা—অতিশয় দুষ্ট, দুরাচারী
রঙ্গরস—তামাসা, হাসিঠাট্টা
পর্বত কন্দর—পাহাড়ের গুহা

কবিতারচনারম্ভ

স্বগত—মনে মনে। স্বহস্তে নিজ হাতে।
ঔদাসীন্য—উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা
দণ্ডধারী—হাতে যে লাঠি ধারণ করে
দ্বিধা—কুণ্ঠা। মীনগণ—মৎস সকল।

স্বদেশী যুগের কথা

হতভম্ব কাণ্ড—কিংকর্তব্যবিমূঢ়
প্লেগ—একপ্রকার সংক্রামক রোগ
সেল্ফ স্যাকরিফাইস—আত্মত্যাগ
ন্যাশন্যাল ফাণ্ড—জাতীয়ভাণ্ডার
বরাভয়—অভয়। ডাকাবুকো—বেপরোয়া।

লালুর পাঁঠাবলি

তুরপুনের ফলা—কাঠফুটো করবার যন্ত্র
জিমনাষ্টিকের আখড়া—শরীর চর্চার স্থান

বজ্রমুষ্টি—কঠিন মুঠা
জগজ্জননী—জগতের সকলের মাতা

কেদারনাথের পথে

তুষারময়—বরফ-ঢাকা। কুহেলিকা—কুয়াশা।
অপ্রতিহত—অবাধ, বন্ধন নাই এমন
আর্তস্বর—কাতর স্বর

মহাশূন্যে মানুষের পদক্ষেপ

স্বর্ণাক্ষর—উজ্জ্বলবর্ণে
অবতরণ করে—নিচে নামিয়া আসে
প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে—প্রতিযোগীরূপে
মহাকাশ সন্ধানী—মহাশূন্যের অনুসন্ধানকারী
নভশ্চারী—আকাশে ভ্রমণকারী
উদ্ঘাটিত—উন্মোচন

আমাদের জাতীয় পতাকা

ঐতিহ্য – পরম্পরাগত উপদেশ বাক্য
ত্রি র্ণ রঞ্জিত – তিন রঙে রাঙানো
প্রজাতন্ত্র দিবস – রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র দিবস
ইউনিয়ন জ্যাক – ইংলণ্ডের জাতীয় পতাকা
আনুষ্ঠানিক ভাবে – প্রথাগত নিয়মে
উড্ডীন – উড্ডীয়মান, উড়িতেছে এমন
শপথ – প্রতিজ্ঞা, দিব্য

স্বামী বিবেকানন্দ

নবজাগৃতি – নূতন জাগরণ
স্বর্ণপ্রসূ – সোনা প্রসব করে এমন যে
মোহাচ্ছন্ন – অজ্ঞতার ভ্রান্তি
তীক্ষ্ণধী – ধারাল বুদ্ধি। অর্থকৃচ্ছ্রতা – অর্থকষ্ট।
অভ্রভেদী – আকাশ বিদীর্ণকারী
অভিনিবেশ—মনোযোগ। মহীয়ান – সুমহান।
জ্ঞানালোক—পাণ্ডিত্যের আলো

বাঙালীর আবিষ্কার

রক্ষণশীল – রক্ষার প্রবণতা
মনীষার – প্রজ্ঞার
অবিস্মরণীয় – যা ভোলা যায় না
যুগান্তকারী – যুগসৃষ্টিকারী
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ – শপথবদ্ধ
স্তিমিত – নিশ্চল, অনুজ্জ্বল
স্নায়ুমণ্ডল – স্নায়ুতন্ত্র জাল

বিদ্যাসাগর

জীবনচরিত—জীবনী গ্রন্থ। পাণ্ডিত্য—জ্ঞান।
পৌরুষ—পুরুষোচিত আচরণ
অধ্যবসায়ী—নিয়মিত যত্নশীল
ইস্তফা—শেষ-ত্যাগ পত্র দেওয়া

কবি মাতৃভাষা

নিজাগারে—নিজগৃহে
পরিহরি—ত্যাগ করিয়া
নিরানন্দ—আনন্দহীন
অশন—ভোজ্যদ্রব্য, খাবার
ইষ্টদেবের—উপাস্য দেবতাকে
বঙ্গের কুললক্ষ্মী—বঙ্গ-সরস্বতী। নিশার—রাত্রির

জন্মভূমি

স্মৃতি সুখকর—যাহা স্মরণে সুখ পাওয়া যায়
স্মৃতি পরিমল মাখা—স্মরণে সুগন্ধে ভরপুর
সমুদয়—সমস্ত। ঐশ্বর্য—সম্পদ, ধনরত্ন।
অতুলন—তুলনাহীন, অতুলনীয়

গ্রাম্যছবি

পিঁজরায়—খাঁচায়। দুলদুল—দোলন্ত।
স্তব্ধ—নিঃঝুম, নিথর। দ্বিপ্রহরে—দুপুরে।
শ্যাম—শ্যামল, সবুজ। সুধাময়ী—অমৃতময়ী, মধুর।

বাংলার মাটি, বাংলার জল

পুণ্য—পবিত্র। পূর্ণ—ভরা, পরিপূর্ণ।
বাঙালীর পণ—বাঙালীর প্রতিভা
বাঙালীর কাজ—সব কিছুর ঐক্য সাধনের কাজ

ছোটো বড়ো

চৌকি—ছোট তক্তাপোষ, বেদী
খিড়কি—পিছনের দরজা
কেমনতর—কি রকম। পরুক—পরিধান করুক।

কণিকা

অতল—অথৈ, তলহীন, সুগভীর
নিমেষ—মুহূর্ত, কাল
তুচ্ছ পরিণাম—সামান্য পরিণতি
অনন্ত—যাহার অন্ত নাই এমন
করুণার দান—দয়ার দান
স্বর্গসুখ—আনন্দ, অত্যানন্দ

আ-মরি বাংলাভাষা

আ-মরি—আহামরি
গরব—গরিমা, গর্ব, অহংকার

বাংলা দেশ

দূর্বাকোমল—দূর্বাঘাসের মত নরম
মরাল—রাজহংস। মরমে—মর্মে।
পিতৃ-পিতামহ—বাপ-ঠাকুরদা
চরণধুলি—পায়ের ধুলি

তরুণ দল

ক্লান্তিহীন—অবসাদ শূন্য এমন
অটল—স্থির, দৃঢ়, টলেনা এমন
বীর্যগরিমা—শক্তির গৌরব
সংযমের—সংযত হইয়া চলার
লাঞ্ছনার—ভর্ৎসনার, অবমাননার

গোঁফ চুরি

ব্যামো—ব্যারাম, রোগ, ব্যাধি
শান্ত—ধীর, স্থির, ঠাণ্ডা প্রকৃতির
খোসমেজাজ—প্রফুল্ল চিত্ত
মুখ্যু—বোকা, জ্ঞানহীন

কিশোর

কুঁড়ি—কোরক। নিখিল—সারা, সমস্ত।
বন্ধনে—বাঁধনে। সৌরভে—সুগন্ধে।
দিক-দিগন্তের—দিক-বিদিকে
নিরুদ্দেশ—উদ্দেশ্যহীন, নিখোঁজ
অগ্রদূত—পথ প্রদর্শক, প্রথম সংবাদবহ
সেনানায়ক—সেনাপতি

সবার আমি ছাত্র

প্রাণ খোলা—উদার হৃদয়
সহিষ্ণুতার—সহনশীলতার
রত্ন আকর—রত্নের ভাণ্ডার
ইঙ্গিতে—ইসারায়। দ্বিধা—সঙ্কোচ।
কণা মাত্র—তিল মাত্র

রানার

নিষেধ—না করার বিধি নিষেধ
দুর্বার—কোন কারণে বারণ মানে না যে
দুর্জয়—অজেয়